তপন রায়চৌধুরী

রোমন্থন অথবা ভীষ্মরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা

AMARBOI.COM

এ-যুগের বাংলা সাহিত্যে আনকোরা স্বাদ যোজনা করল এই গ্রন্থ। তিরিশ আর চল্লিশের দশকে পূর্ববঙ্গের একটি অঞ্চল—বরিশাল জেলা—আর কলকাতার ছাত্রজীবন এর পটভূমি। কিন্তু বিষয়বস্তু মামুলী অর্থে স্মৃতিচারণ বা সমাজচিত্র নয়, আত্মচরিত তো নয়ই। রচনাটির কেন্দ্রে রয়েছে এক বিচিত্র কৌতুকবোধ—গালগল্প, ঘটনা, ছড়া, গান, চরিত্রচিত্র জাতীয় নানা বিষয়ের পরিবেশনের মধ্য দিয়ে যার অনবদ্য প্রকাশ। লেখায় 'বরিশালী সংস্কৃতি'র বলিষ্ঠ বিবরণও আছে, বহু ক্ষেত্রে ওই অঞ্চলেরই 'দেবগন্ধর্ববিনিন্দিতা' ভাষায়। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে সেই ভাষার 'পশ্চিমবঙ্গানুবাদ' অবশ্য দিয়েছেন লেখক, কিন্তু সর্বত্র দিতে ভরসা করেননি। কারণ, তাঁর ভাষায়, 'সেন্সররা আপত্তি করতেন'।

সংস্কৃত-ঘেঁষা গুরুগম্ভীর শব্দের সঙ্গে বরিশালী ভাষা মিশিয়ে এক নতুন ও বিশেষভাবে স্বকীয় রচনাশৈলী সৃষ্টি করেছেন এখানে সুরসিক লেখক। তাঁর উপাদেয় ভঙ্গিতে একদিকে যেন হুতোমী, অন্যদিকে সৈয়দ মুজতবা আলীর অনন্য অনুরণন। শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসে উজ্জ্বল চিরকালীন এ-গ্রন্থটিতে আমাদের সমাজ-জীবনের কিছু বিপর্যয়ের কথাও—যেমন, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগ—এমনভাবে রয়েছে যে, আজকের জাতীয় সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে আরেক দিক থেকে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে এই বিবরণ।

১৯৯২ সালের শারদীয় 'দেশ'-এ এ-লেখার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বস্তরের পাঠকমহলে পায় বিপুল সমাদর ও সংবর্ধনা। বর্তমান গ্রন্থ সেই রচনারই পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত সংস্করণ। একটি সম্পূর্ণ নতুন পরিচ্ছেদ এখানে যোগ করা হয়েছে।

ISBN 81-7215-195-0

অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী (জ. ১৯২৬) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক এবং সেন্ট এন্টনী'স্ কলেজের ফেলো। প্রথম জীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। পরবর্তী জীবনে জাতীয় অভিলেখালয়ে সহকারী অধ্যক্ষ, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিকসের অধ্যক্ষ ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের অধ্যাপক এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে ছিলেন। এ ছাড়া হার্ভার্ড, পেনসিলভেনিয়া ও কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ভিজিটিং প্রফেসর পদে পড়িয়েছেন। তপনবাবু ভারতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রথম সারির পণ্ডিতদের একজন। তাঁর লেখা সামাজিক ইতিহাস Bengal under Akbar and Jahangir, বাণিজ্যের ইতিহাস Jan Company in Coromandal, Europe Reconsidered এবং অধ্যাপক হাবিবের সহযোগিতায় সম্পাদিত Cambridge Economic History of India ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত। Europe Reconsidered ১৯৮৭ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। 'রোমন্থন' ওঁর বাংলায় লেখা প্রথম বই। তপনবাবুর শিক্ষা বরিশাল জেলা স্কুল, স্কটিশ চার্চ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজে। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট. ডিগ্রী পেয়েছেন।

প্রচ্ছদ □ কৃষ্ণেন্দু চাকী

লেখকের আলোকচিত্র ধ্রুবনারায়ণ চৌধুরী

রোমন্থন অথবা ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা

AMARBOI.COM

রোমন্থন

অথবা

ভীমরতিপ্রাপ্তর পরচরিতচর্চা

তপন রায়চৌধুরী

AMARBOI.COM

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

"বুড়ো বয়সে সঙ স্যেজে রং কত্তে হোলো। পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ কর্বেন।"

হুতোম প্যাঁচার নকশা

AMARBOI.COM

লেখকের নিবেদন

১৯৯২ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় বর্তমান রচনাটি প্রকাশিত হয়। বাংলায় দীর্ঘ রচনা লেখার চেষ্টা এর আগে কখনও করিনি। তাই এ ব্যাপারে দ্বিধা এবং আশঙ্কা দু-ই ছিল। সে সব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করলেন খ্যাতনামা লেখিকা অধ্যাপিকা ডক্টর নবনীতা দেবসেন। কাজটা ভাল করলেন কিনা বলা কঠিন। তিনি বললেন, "যে ভাবে কথা বলেন ঠিক সেই ভাবে লিখুন।" সে চেষ্টাই করলাম। যেখানে তিনি অধিকাংশ সময় কাটান, অর্থাৎ রোগশয্যায় শুয়ে তিনি রচনার প্রথমার্ধ শুনলেন। সাংবাদিকা শ্রীমতী পিকো দেব সেন এবং চৌকাঠের ওপারে বসে রন্ধনশিল্পী শ্রীমান কানাইও শুনলেন। তিনজনেই বললেন, "চলবে"। আমাদের অজ্ঞাতে চৌকির নীচে বসে মার্জার দেব সেনও শুনছিলেন। তিনি পা আঁচড়ে দিলেন। বুঝলাম— ওঁর ভাল লাগেনি। অপর পক্ষে কানাই তাঁর স্বীকৃতির স্মারক হিসাবে গুটিকয় চপ ভেজে আনলেন। ফলে উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। মার্জারকে সম্রাট অশোকের অনুশাসন উধৃত করে পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে দু-চারটে থান থান কথা বললাম। রুচির বিভিন্নতা বিষয়ে কালিদাস কবির মতটাও উল্লেখ করলাম। বিশেষ আমল দিল না। তারপরেও অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং ছাত্রদের মাথায় এই লেখার কিছু কিছু অংশ লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করেছি। তাঁদের কেউ কেউ কখনও কখনও মুহ্যমান হলেও "চণ্ডালের হস্ত দিয়া পোড়াও পুস্তকে ভস্মরাশি ফেল তার কর্মনাশা জলে" বলে অভিনন্দন জানাননি। বোধ হয় বইটা প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন। আর খরার ফলে কর্মনাশার জলও কিছু কমে গেছে। তা' ছাড়া মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট বার হওয়া অবধি অনেক বামুনকায়েত চণ্ডাল হওয়ার দাবীতে ভুখা হরতাল করছেন। 'সোম' পদবীধারী জনৈক সাত-হাজারী মনসবদার ডোম হবার জন্য হাইকোর্টে মুচলেকা দিয়েছেন। এই সব কারণে আহ্লাদিত হয়ে লেখাটা বই করে ছাপাবার কথা ভাবলাম।

সাগরদা তাঁর পত্রিকায় অপরিচিত লেখকের লম্বা লেখা ছাপাবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাদলবাবু বই ছাপাতে রাজী হলেন। তাঁর সাহস অন্তহীন। ফলে আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ। বন্ধন কিছুটা শিথিল হলে ধন্যবাদ দেওয়া যাবে।

পাশ্চাত্য দেশে এক নির্লজ্জ প্রথা আছে—পত্নীকে বই উৎসর্গ করা এবং অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যে সব মনুষ্য রাস্তাঘাটে খালে-বিলে আলিঙ্গন-চুম্বনে অভ্যস্ত তারা যে ছাপার অক্ষরে বেলেল্লাগিরি করবে এ আর বিচিত্র কি ? কিন্তু বলি, ব্যাপারটা কি ? পত্নীপ্রেম সাধারণ্যে শিঙা ফুঁকে ঘোষণা না করলেই নয় ? এ লাইনে যারা বেশী বাড়াবাড়ি করে তাদের বিবি তালাক অবশ্যম্ভাবী। বৌকে ধন্যবাদ দিতে হয় ত ল্যাভেন্ডার রঙের "যাও পাখী বোলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে"—মার্কা কাগজে চিঠি লেখ, লিখে বালিশের পাশে রেখে দে। আমাদের জ্বালাবার হেতু কি ?

এই মনোভঙ্গী সত্ত্বেও বর্তমান রচনাটির প্রসঙ্গে স্ত্রী ও কন্যার উল্লেখ করতে হল। গত বত্রিশ বছর ধরে স্ত্রী এবং বোধোদয় হওয়া অবধি কন্যা আমার অক্লান্ত ব্যাজর ব্যাজরে উত্যক্ত। লিখতে বসে যে সব অকথ্য কথন আমি ভুলে গিয়েছিলাম, তার অনেকগুলি তাঁরা মনে করিয়ে দিলেন। সুতরাং এই লেখার দায়ীত্ব অংশত ওঁদের।

'দেশে' লেখাটি পড়ে দু-একজন জিগেস করেছেন— এ সব গালগল্প কি সত্যি ? মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেব [অবশ্যি এ বই বের হতে হতে উনি চাকরি বদলাবেন মনে হচ্ছে] বলেছেন, "অভব্য প্রশ্নের আমি জবাব দিই না।" ভদ্দরলোক মাত্রেই একই কথা বলবেন। সত্যের খাতিরে শুধু উল্লেখ করছি,— আমার বাড়ির লোক এবং বন্ধুবান্ধব আমার কোনও কথাই ধর্তব্য মনে করেন না। মুখ খুললেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার বলেন, "এই, তপনদা আবার শুরু করলেন।" ঐতিহাসিক হিসাবে ওঁর খ্যাতির অন্যতর কারণ তথ্যের সত্যতা নিরুপণে ওঁর অসাধারণ পটুত্ব। পাঠকরা এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে আমার কিছু বলার নেই।

লেখক

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

সূচী

প্রারম্ভিক মুখব্যাদান ১১
কথারম্ভ ১৫
রোমঞ্চক/রোমহর্ষক ইতিহাস ২৩
নিজ মৌজা কীর্তিপাশা ২৮
শাসন, শোষণ ও প্রজাপালন ৩৭
জনৈক ব্রহ্মদৈত্য ও তাঁর সহগামী কয়েকটি ভূত ৪৬
শহর বইরশাল ৫৬
ক্রান্তিকাল ৮০

প্রারম্ভিক মুখব্যাদান

(মুখ খোলাকে 'মুখবন্ধ' বলা নিতান্তই অর্থহীন)

বর্তমান রচনাটি আত্মচরিত না এ কথাটা ভাল করে বোঝাবার জন্য শিরোনামায় পরচরিত কথাটা ব্যবহার করলাম। আত্মঘাতী বাঙালীমাত্রেই (বাঙালীমাত্রেই আত্মঘাতী এ কথা এখন সর্বজনবিদিত, শুধু ক্ষোভের বিষয় এত আত্মহত্যা সত্ত্বেও কলকাতার রাস্তায় ভীড় কমছে না) পরচরিত আলোচনা পছন্দ করেন। ফলে বইর নাম দেখে দু-চার কপি কিনতেও পারেন, সে কথাও চিন্তা করলাম। তা ছাড়া আরও ব্যাপার আছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধে "কতক নোট" সংগ্রহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আপত্তি জানিয়ে বঙ্কিম বলেন, "আমার জীবন অসার।" এ কথা আমিও বলতে পারতাম। কিন্তু বঙ্কিম যা বলে পার পেয়ে গেলেন (শুনে সবাই "হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ, ন্যা ন্যা ন্যা ন্যা, কি বলছেন স্যার" বলে প্রবল শিরঃকম্পনে ঘাড়ের স্পন্ডিলোসিস সারিয়ে ফেলল), তা আমি বললে চেনা অচেনা সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় দেবে। অতএব ওদিক দিয়ে গেলাম না।

আসল কথা আমার লেখার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভীমরতি বা dotage-এর অন্যতম লক্ষণ anecdotage অর্থাৎ বাজে গল্প ফাঁদা (পাঠিকা/ পাঠক স্মরণ করুন, গড়িয়াহাটের মোড়ে যে বৃদ্ধকে দেখিলেই আপনি অনতিবিলম্বে পলায়নতৎপর হন !)। এই ব্যাধি শুধুমাত্র জরার লক্ষণ না। বর্তমান লেখক এই রোগে আশৈশব ভুগছে। ফলে পরিচিত মহলে তার খোজা নাসিরুদ্দিন বা গোপাল ভাঁড় গোছের একটা কুখ্যাতি আছে। কিছুদিন আগে এক আত্মঘাতী আড্ডায় (আড্ডাই বাঙালীর আত্মহননের প্রধান অস্ত্র) কয়েকজন শুভার্থী বললেন, "দাদা, আর কদিনই বা আছেন, ওগুলো লিখে ফেলুন।" বুঝলাম, শেষের সে ভয়ঙ্কর দিন সমাগত—যেদিন অন্য লোকে বাক্য কবে আমি রব নিরুত্তর। কি হ্যাঁপা, ভেবে দেখুন। সৌভাগ্যবশত ব্যাপারটা কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আমার দু-একজন পরিচিত ব্যক্তি আছেন যাঁদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরাই শুধু বাক্য কন, উত্তরের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সে কথা যাক। বন্ধুদের যুক্তিটা অকাট্য মনে হল। এন্তেকাল বা অন্তকাল পৌঁছবার আগে আজন্মসঞ্চিত ইয়ার্কি-ফাজলামিগুলি উত্তরপুরুষের হাতে সমর্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।

আরও একটা কথা চিন্তা করলাম। অনেক কেঁদে ককিয়ে খান চার-পাঁচ

সরু-মোটা বই লিখেছি। সেগুলি বিক্রিটিক্রি হয় না। অপাঠ্য বা অ-পাঠ্য, যে কারণেই হোক সে সব কেউ পড়েও না। জনৈক বন্ধুকে একবার এক খণ্ড উপহার দিয়েছিলাম। সেদিন দেখলাম তাঁর কনিষ্ঠ তনয় সেটিকে তবলা হিসেবে ব্যবহার করছে। জিনিসটা কাজে লাগছে দেখে বড় আহ্লাদ হল। বইগুলি একেবারে কেউ পড়ে না তা নয়। এই ত সেদিন একজন বলে পাঠালেন, "ওকে বোলো, ওর সাম্প্রতিক বইটা ওর অন্যান্য লেখার মত সম্পূর্ণ অখাদ্য হয়নি। তবে কুড়ি বছর আগে এ সব কথাই আমি লিখেছি। তা ছাড়া ওর ইংরিজিটা ঠিক আসে না। চেষ্টা করে যাক, কালে আমার স্তরে না পৌঁছলেও, হয়ত মোটামুটি শুদ্ধ লিখতে পারবে।" ঐ বইখানা পড়েই দু-চারজন পণ্ডিত ব্যক্তি পত্রপত্রিকায় দু-চারটে ভাল কথা লিখেছিলেন। কোনও দৈবঘটিত কারণে তাঁদের অধিকাংশরই পদবী দাশগুপ্ত। পাঠকগোষ্ঠী এত সীমিত হলে কি আর বই বাজারে চলে ? পৃথিবীতে কজনই বা দাশগুপ্ত আছেন ?

সব দেখেশুনে বন্ধুরা আবারও বললেন, "অনেক ত হল, এবার একটু অন্য লাইনে চেষ্টা দেখ।" সেই সদুপদেশেরই পরিণাম এই রচনা।

যাঁদের বাজে ইয়ার্কি অপছন্দ তাঁরা এই পর্যন্ত পড়েই ক্ষান্ত দিন। নয়ত অকারণে বিরক্তি এবং তৎসহ রক্তের চাপ হু হু করে বেড়ে যাবে, বিটা ব্লকার, নিফেডেপিন, মূত্রবর্ধক দাওয়াই কিছুতেই শানাবে না। গম্ভীর প্রকৃতির সদ্ব্যক্তির জন্য অনেক ভাল ভাল বই আছে। Nichomachaean Ethics, Principia Mathematica, Das Kapital, মোহমুদ্গর, আরও কত। সাম্প্রতিকদের মধ্যে Foucault, Lacan, Derrida (যে দাদা কলকাতা শহরে একটু দেরিতে পৌঁছেছেন*) এঁরা সব আছেন। পড়লে বুঝুন বা না বুঝুন চরিত্রের উন্নতি হবে। অদ্দূর যেতে না চান, হাতের কাছে 'দেশ' পত্রিকায় মনীষী অম্লানদার লেখা আছে। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে খোঁজ করলে 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকাও পাওয়া যায়।

লিখতে বসে একটা দুঃখ রয়ে গেল। বাঙালী সংস্কৃতির একটি বিশেষ সম্পদ—খিস্তি-খেউড়। স্বর্গত দোদো-দা বা সৈয়দ মুজতবা আলীর মারফত এই দৌলতখানা যাঁদের চেতনাগোচর হয়েছে, এর গভীরতা, পরিধি তথা মাহাত্ম্য চিন্তা করে তাঁরা শ্রদ্ধায় নতমস্তক। পেট্রোনিয়ুস থেকে রাবেলে-বালজাক অবধি পাশ্চাত্য খিস্তির গুরুস্থানীয়রা সেই মহাসম্পদের তুলনায় বিলকুল হতমান, নিতান্তই তুশ্চু। উপর্যুক্ত দুই মহাপ্রাণ বাঙালী আমাদের যে অন্যতর ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন, তার ছিটেফোঁটা বর্তমান লেখকের তহবিলেও ছিল। পশ্চিমে দুষ্টরসের সুভাষিতাবলীর নিয়মিত সংকলন বের হয়। থান ইটের সাইজের কেতাবে তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও আবার বঙ্কিমকে স্মরণ করতে হল। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় অশ্লীল কিন্তু রসোত্তীর্ণ পঙক্তিগুলি বর্জন করার কারণ ব্যাখ্যা করে বঙ্কিম লেখেন, "কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ

* এই মন্তব্যটা এক প্রগতিশীল ঐতিহাসিকের। বিনা অনুমতিতে মেরে দিলাম।

অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না।" বর্তমানে বাঙ্গালা লেখক এবং পাঠকের অবস্থা অবিশ্যি অনেক উন্নত। বিদেশী ফিলিম এবং কাগজে বাঁধাই বইয়ের দৌলতে নরম ও গরম উভয় জাতীয় বাঁদরামি হজম করে সবাই শিবত্ব অর্জন করেছেন। তবুও বাঙালী ঐতিহ্যের উচ্চকোটির বদরস x সার্টিফিকেট লাগিয়েও বাজারে ছাড়া যাবে না। জ্যাকিদা ঊষা উত্থুপকেই অপসংস্কৃতি বলে নাক সিঁটকালেন,— অন্যে পরে কা কথা! এ সব ভেবে মনে বড় কষ্ট হল। সবই ত যাচ্ছে। আরব তৈল শেখদের দৌলতে বাঙালীর প্রাণতুল্য চিংড়িমাছ মনমোহন সিংহের মন প্রফুল্ল করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছে। কিন্তু জাতীয় জীবন থেকে সে বস্তু প্রায় অপসৃত— ২২০ সেরে কৃষ্ণবর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে গড়িয়াহাট বাজারে সে আত্মবিক্রয় করছে। চিংড়ি কি বস্তু বুঝতে উত্তরপুরুষদের এনসাইক্লোপেডিয়া ঘাঁটতে হবে। বেচারারা পূর্বপুরুষের অন্যতরা মহতী কীর্তি, বঙ্গবদরসসাগরও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবে? চিংড়িহীন নিরানন্দ জীবনে তবে তারা কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? একবার ভাবলাম স্বর্গত সুশীল দে মশাই ত বাংলা প্রবাদসংগ্রহ অভিধানের আকারে ছাপিয়ে অনেক আকথা-কুকথা লিখে পার পেয়ে গেলেন। সেই আদর্শে একটা সুচিন্তিত মুখবন্ধ সহ "বাংলা খেউড় সংগ্রহ" নামে একটি পুরুষ্টু সংকলন প্রকাশ করি। সাহস পেলাম না। "পলিতকেশ বৃদ্ধ অশ্লীলতার দায়ে দায়রায় সোপর্দ,"— কাগজে এ ধরনের হেডলাইন আত্মীয়কুটুম্বদের পছন্দ হবে না। উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী সাহেবরা অবশ্যি চিন্তার স্বাধীনতার জন্য লেখকের হয়ে এক হাত লড়ে যেতেন। "গার্ডিয়ান" পত্রিকা একটা সুতীব্র সম্পাদকীয় লিখত। দেশে মানসী দাশগুপ্ত অসীমীর সমর্থনে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাক্ষী দিতেন— বলতেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে"র তুলনায় এ ত নস্যি।* এক ধরনের খ্যাতি হত ঠিকই। কিন্তু অনেক চিন্তা করে দেখলাম, ব্যাপারটা সুবিধের হবে না। তাই ঠিক করেছি, একটি "সম্পূর্ণ খেউড় সমগ্র" সংকলন করে মওলানা সাহেবের আত্মজীবনীর শেষ ত্রিশ পৃষ্ঠার মত সিল মেরে রেখে যাব। আজি হতে শতবর্ষ পরে উত্তরপুরুষরা সিল ভেঙে প্রকাশ করবেন। তা হলে অমরত্ব একেবারে গ্যার‍্যান্টিড। ধরে নিচ্ছি ততদিনে বাঙ্গালা পাঠকের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হবে।

এই প্রারম্ভিক মুখ্যবাদানে আরও একটা কথা বলি। বর্তমান রচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তু জেলা বরিশাল এবং সেখানকার মানুষজন। বীরধর্মী সেইসব মানুষের চিন্তা এবং ভাষায় একটা অদম্য পৌরুষ ছিল। মানব শরীর এবং তদ্ঘটিত যাবতীয় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে তাঁদের মনোভঙ্গী ক্লাসিকাল স্পষ্টতায় ভাস্বর। তাঁদের ভাব ও ভাষা কোমলগম্ভীর সুমার্জিত রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে সম্পূর্ণ নারাজ ছিল। সে ভাষা সত্যেন দত্ত-কীর্তিত বীর বাঙালির মত এক হাতে মগ এবং আর হাতে বিদেশীকে রুখবার শক্তি রাখে, স্বদেশীরাও শুনলে লজ্জাবেগুনী মুখে পালাবার পথ পায় না। সেই মত্ত বারণকে কি শৃঙ্গহীন পোষা-গরু বানান চলে? তাই উদ্যত

* অবচীন পাঠককে জানিয়ে দিচ্ছি যে স্বর্গত বুদ্ধদেব বসুর "রাতভর বৃষ্টি" নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগে মামলায় ডক্টর দাসগুপ্ত বুদ্ধবাবুর সমর্থনে এই লাইনেই সাক্ষী দিয়েছিলেন।

কাঁচিকে বহু দ্বিধায় মাঝে মাঝে সংবরণ করেছি। "এখনকার.... অবস্থা" বিবেচনা করিয়া অনেক ভেবে চিন্তে মাঝে মাঝে সেই দেবগন্ধর্ববিনিন্দিতা মহতী ভাষার পশ্চিমবঙ্গানুবাদ দিয়েছি। তবে সর্বত্র না। সেন্সররা আপত্তি করতেন। সব কথা খুলে বললাম। এবার সম্পাদকমণ্ডলী বিবেচনা করুন, এই অকিঞ্চিৎকর রচনা বয়ঃপ্রাপ্তা/প্রাপ্ত পাঠিকা/ পাঠকদের পড়তে দেওয়া সমীচীন হবে কি না।

AMARBOI.COM

কথারম্ভ

যদি কোনও ইংরাজ বা ফরাসী তাদের অধুনালুপ্ত সাম্রাজ্য নিয়ে বোকা চালিয়াতি করে, ত' পাঁচটা ভদ্দরলোকে লোকটাকে একটু আড়চোখে চেয়ে দেখে। প্রগতিবাদী সাদা মানুষেরা পূর্বপুরুষের সাম্রাজ্যের কথা উঠলে লজ্জায় কেঁচো বনে যায়,* পালাবার পথ পায় না। কিন্তু অনেক বাঙালির মধ্যেই 'পিদারম্ সুলতান বুদ্'— অর্থাৎ মদীয় পিতাঠাকুর ছোলতান আছেলেন, এই ভাবটি এখনও প্রবল। এঁরা সবাই কংসরাজার বংশধর। যাঁর প্রপিতামহ জমিদারের কাছারিতে বছরে পাঁচ সিকে খাজনা জমা দিতেন, তিনিও শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামহিম কানাই পেস্কারের রক্ত ধমনীতে বহমান, এই আনন্দে রেশনের চাল ভক্ষণের দুঃখ ভুলে থাকেন। সকলেই সসাগরা ধরণীর চক্রবর্তী সম্রাটের ঘরে জন্মেছেন। ভাবান্তর হয়ে যাঁর পকেটে লাল কার্ড, তাঁরও এই ব্যাপারে মোহান্ত ঘটে না।

বোধহয় এই কারণেই জমিদারি প্রথাকে সামন্ততন্ত্র বলে বর্ণনা করার রেওয়াজ প্রগতিশীল মহলে এখনও চালু। চিন্তাশীল প্রগতিশীলরা অবশ্যি প্রথাটিকে শতকরা একশ ভাগ সামন্ততন্ত্র বলেন না। কেউ তিন পোয়া, কেউ আট আনা, কেউ সিকি সামন্ততন্ত্র বলছেন। যাঁদের চিন্তা আরও গভীরে গেছে, তারা ব্যাপারটাকে সামন্ততন্ত্রের ছোটতরফের পুত্তুর, bastard feudalism-- মানে হারামজাদা সামন্ততন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। সেই গুরুগম্ভীর আলোচনায় প্রবেশের পথই বিজৃম্ভন-ক্লিষ্ট, ভেতরে ঢুকলে ত কথাই নেই। অতএব, থাক।

আমার শুধু জিজ্ঞাস্য, বাবাসকল, সামন্ত চোখে দেখেছ কখনও ? এই প্রচণ্ড গরমের দেশেও কাঠ-ফাটা রোদে জোব্বাজাব্বা পরে, সর্বাঙ্গে হীরে মোতি জড়িয়ে, মাথায় পাঁচটা বাঁধাকপির সাইজের পাগড়ি, কোমরে তলওয়ার, হাতে

* অনেক বাংলা phrase-idiomই সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। কেঁচো যে কুলবধুর মত লজ্জাশীলা, ভাষাসৃষ্টিকারেরা এই তথ্য কোথায় পেলেন ? অবশ্যি বলতে পারেন লজ্জায় কুঁকড়ে কেঁচো বনে যায়। কিন্তু কেঁচো কি কুঁকড়ায় ? কুঁকড়ায় ত' কেন্নো। যাক গে, পাঁচজনে বলে, তাই লিখলাম। তা ছাড়া বরাবর প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ফুটনোট দেওয়া অভ্যেস, হঠাৎ ছাড়তে পারি না। সহকর্মীরা চিন্তিত হবেন।

বল্লম, কাঁধে তীরধনুক নিয়ে হাতিঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ খুন করে বেড়াত তারা। কাজটা কিছু ভাল না, তবে ঐ গুণ্ডাগুলোকে দেখে ভক্তি না হলেও ভয় হত। যে সব বাঙালি বাবু সামন্তর ছানা বলে গর্বে ফেটে পড়েন, তাঁদের পূর্বপুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নায়েব, পেশকার, বেনিয়ান জাতীয় ছা-পোষা মানুষ ছিলেন। মাছ দুধ সস্তা থাকায় একটু হয়তো মোটাগাঁটা ছিলেন। পেটের গোলমালটাও কিছু কম হত। এ ছাড়া গৌরব করার মত খুব কিছু ছিল বলে মনে হয় না। ইংরাজের ধামাধারণ করে দু'চারজন বেশ গুছিয়ে বসেছিলেন, এমনকি রাজা-গজা খেতাবও মিলেছিল কারও কারও কপালে। আর যে ক'ঘর বামুন-ক্ষত্রিয় গম-বাজরা খেতে খেতে বিরক্তি ধরায় আর্যাবর্ত ছেড়ে বংভূমে এসে লেঠেল-বদমাশ জুটিয়ে কয়েকশ' বছর ধরে গরিব রায়তের জান কয়লা এবং পরস্পরের মুণ্ডু ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদ করে কাটালেন, কর্ণ-বালিস সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফাঁদে পড়ে সেই সব বাঘের বাচ্চারাও অচিরে সিক্ত মার্জার বনে গেলেন। হিসেব-কেতাব বুঝতেন না বলে অনেকে ত' পথেই বসলেন। তার পরবর্তী ইতিহাসও খুব গৌরবের নয়। প্রজার টাকার ছিটেফোঁটা খরচা করে দু-চারটে ইস্কুল, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, খাল, পুকুর হল, দু-চারজন জমিদারসন্তান গানবাজনা সাহিত্য নাটকের পৃষ্ঠপোষণ করলেন। বেনিয়ান থেকে জমিদারে উত্তীর্ণ এক বাঙালী পরিবারে একটি অতিমানবিক প্রতিভার জন্ম হল বটে। কোন্ সুকৃতির ফলে এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটল তা আমার জানা নেই, তবে সেই অনর্জিত সৌভাগ্যের সঙ্গে জমিদারি প্রথার কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, এই তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ধান ভানতে বসে জমিদারি প্রথা সম্পর্কে এই শিবের গীতটি সম্পূর্ণ অহেতুক না। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার পূর্ববঙ্গের কিছু মানুষ আর জায়গার কথা লিখতে বসেছি। উনিশ শ' চুয়াত্তর সনে ছাব্বিশ বছর পরে ঐ অঞ্চলে আবার যাই। মাত্র কটা বছরের ব্যবধানে একটা জায়গা যে সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে, একটা সমাজের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে যেতে পারে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলে এমন কথা বিশ্বাস করতে পারতাম না।

বরিশালের স্টীমার ঘাটে নেমে কালেক্টরেট পর্যন্ত পথ খুঁজে পেতে কষ্ট হল না। তারপর পুলিশ কোর্ট। নতুন কিছু দালান উঠে রাস্তাটা আর চেনা যায় না। কোর্টের পাশেই ত' বাড়ির রাস্তাটা ছিল। একটা পুকুর, তার পারে ছাতিম আর কাঠচাঁপা গাছের মাঝখানে একটা গেট। দেখলাম সে সব আর কিছু নেই। চারদিকে প্যাচপ্যাচে কাদা, তার উপর কিছু বেড়ার ঘর। যেখানে পুকুর ছিল, সেখানে মাটি ফেলে এক সিনেমা-ভবন খাড়া হয়েছে। বাড়িটা বেমালুম নিখোঁজ। নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করলাম, "কীর্তিপাশার বাড়ির রাস্তাটা কোথায় বলতে পারেন ? নাবালক লজের রাস্তা ?" নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সুরে নেতিবাচক উত্তর পেলাম। ঐ সব নাম কেউ জানে না, কখনও শোনেনি। বংশগত আত্মাভিমানের যা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল, তা যেন পদ্মার জলে বিলীন হল।

'নাবালক লজ'— এই নামটার ব্যাখ্যা করব বলেই জমিদারি প্রথা সম্বন্ধে আমার প্রারম্ভিক বাগবিস্তার। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বরিশাল শহরে কীর্তন

খোলানাল্লী নদীর পারে যে বাংলো-বাড়িটিতে বর্তমান লেখকের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে, স্থানীয় লোকের কাছে সেই বাড়িটা ঐ বিচিত্র নামে পরিচিত ছিল। 'নাবালক লজ' আসলে মধ্যপদলোপী সমাসের একটি ইঙ্গবঙ্গীয় উদাহরণ। পুরো নামটা নাবালক বাবু'স লজ। লেখকের প্রপিতামহ, যিনি ঐ লজের প্রথম মালিক, তিনি একদা নাবালক বাবু বলে পরিচিত ছিলেন। ভদ্রলোক বছর পঁয়ত্রিশ বয়সে গতাসু হন। তিনি চিরনাবালক বা চিরকুমার ছিলেন, এমন না। (দ্বিতীয় ঘটনা ঘটলে এইসব লেখার সুযোগ পেতাম মনে হয় না)। নাবালক বয়সে সম্পত্তি এবং উক্ত লজের অধিকারী হন বলেই ভদ্রলোক ঐ অস্বস্তিকর বিশেষণে ভূষিত হন। সঙ্গদোষে বাড়িটারও আর সাবালকত্বপ্রাপ্তি ঘটেনি। ঐ বাড়িতে বাস করতাম বলে অনেক হেনস্তা হয়েছে। এমন নাম পেলে ইস্কুলের বখা সহপাঠিরা তার সদ্ব্যবহার না করে ছেড়ে দেবে মনুষ্যচরিত্রে এরকম অহেতুকী করুণা আশা করা নিতান্ত অলীক।

সে কথা যাক। নাবালক বাবু প্রসন্নকুমার সেন বেশ কয়েক পুরুষের জমিদার। সেই সুবাদে তস্য পুত্ররা রায়চৌধুরী পদবী ধারণ করলেন। তাতে আপত্তি করার কিছু নেই। শুধু উত্তরপুরুষের দু-চারটে ছিটকে পাশ্চাত্যবাসী হবে এ কথা চিন্তা করে কাজটা না করলেও পারতেন। 'সেন' কিছু খারাপ পদবী না। এক লক্ষ্মণ সেনের একটু দুর্নাম আছে ঠিকই। কিন্তু অপরপক্ষে বল্লাল সেন থেকে অমর্ত্য সেন অবধি অনেক ভাল ভাল লোক ঐ পদবী নিয়ে দিব্যি তুষ্ট ছিলেন ও আছেন। * অযথা ঝামেলা করেননি। বঙ্গদেশবাসীদের কাছে 'রায়চৌধুরী' কথাটা উচ্চারণ করা নেহাতই নস্যি হতে পারে। কিন্তু ওটা বলতে বা লিখতে সাহেবদের যথারীতি দাঁত ও কলম ভেঙে যায়। ব্যাঙ্কের কেরানি আর বিপণীবালারা শুনে ফিকফিক করে হাসে। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর কিছু করার নেই। পাঠিকা-পাঠকগণ, (বহুবচন ব্যবহার করছি, কারণ বাংলাভাষায় দ্বিবচন নেই; লেখক ছাড়া অন্তত প্রুফরিডারের লেখাটা পড়তে হবে, সুতরাং ব্যাকরণ-অশুদ্ধি হয়েছে বলতে পারবেন না) ক্ষমা করবেন। ষাট পার হলে মানুষের বাজে বকার অভ্যেস হয়। অধিকাংশ মানুষের তার অনেক আগেই হয়। কারও কারও বাক্‌স্ফূর্তির সূচনা থেকেই।

সেই সুবাদে জমিদারি প্রথার সামন্ততান্ত্রিক 'পরিপ্রেক্ষিতের'** আরেকটু

* লক্ষ্মণ বাবুকেও বিনা বিচারে খরচের খাতায় তোলা উচিত হবে না। ওঁর দিকটাও একটু ভেবে দেখুন। মনে করুন আপনার বয়স আশী ছাড়িয়েছে। (বালাই ষাট, আপনাদের বয়স আশী ছাড়াতে যাবে কেন? এমনি কথার কথা একটা বললাম। ঠাকুরের দোয়ায় পাঠিকাদের বয়স পঁচিশ এবং পাঠকদের তিরিশ যেন কখনও না ছাড়ায়।) স্নান সেরে সোনার থালাটা টেনে নিয়ে সবে আহার সুরু করেছেন। তালপাতার পাখা দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে রানীমা বলছেন, "ঐ লাবড়া দিয়ে পেট না ভরিয়ে, মাছটা খাও। বুড়ো হয়েছ, নোলাটা কমেনি।" এমন সময় সতেরটা মুজাহিদিন 'কিশমিশ-পিশতা' 'কিশমিশ-পিশতা' বলে হৈ হৈ করে নাচতে নাচতে হাজির। আপনি কি তখন মালকোচা মেরে তাদের সঙ্গে কুস্তি করতে যেতেন? না, খিড়কির দোর দিয়ে বের হয়ে দীঘির পারে গিয়ে একটু শান্তি খুঁজতেন?

** শব্দটা আমার বড় যুৎসই লাগে। আধুনিক বাংলাভাষার চেহারা যা দাঁড়িয়েছে, ভাবলেই রোমঞ্চ হয়। ইংরাজী না জানলে বোঝে কার বাপের সাধ্যি? 'ফলশ্রুতি', 'মূল্যায়ন' 'বক্তব্য রাখা'—এ সব শুনলে পূর্বসূরীরা মুচ্ছো যেতেন। আর 'মাধ্যম'? আকার লোপ করে আদিতে 'উত্তম' জুড়লে আরও আহ্লাদজনক।

আলোচনা করি। জমিদারি প্রথা যদি তিন পোয়া বা চার আনা সামন্ততন্ত্র হয়, তা হলে নাবালক বাবুর পূর্বপুরুষগণ গবেষকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দু'আনা বা এক আনা সামন্ত ছিলেন। 'হারামজাদা সামন্ততন্ত্র' এই বিশ্লেষণী আয়ুধ (tool of conceptualisation) এ ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। কারণ যত দূর জানা যায় উক্ত বৈদ্যপুঙ্গবগণ সবাই যথারীতি বামুন-পুরুত ডেকে বিবাহসংস্কার সমাধা করেছিলেন। যদি কেউ ইদিক-উদিক কিছু করে থাকেন ত' বংশেতিহাস সে বিষয় নীরব। জনৈক মনীষী লিখেছেন,— তাঁর মধ্যস্বত্বভোগী পূর্বপুরুষগণ ফরাসীতে যাকে petite noblesse বলে, সেই জাতীয় কিছু ছিলেন। মনীষীটি আকারে petite, হয়ত জাতে noblesse হবেন,— এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু নাবালক বাবুর পূর্বপুরুষদের বর্ণনা করতে অর্ধপরিচিত ম্লেচ্ছ ভাষা আমি ব্যবহার করব না। কারণ উক্ত ব্যক্তিসকল আমারও পূর্বপুরুষ। তাঁরা জ্ঞানত আমার কোনও অপকার করেননি। অকারণে তাঁদের গালি-গালাজ করি কেন ? আহ্, খালি প্যাচাল পেড়েই মরছি, আসল কথায় আর আসাই হচ্ছে না।

আসল কথাটা হচ্ছে বংশেতিহাস। মানে কিভাবে নাবালক বাবুর পূর্বপুরুষরা দুই আনা বা এক আনা সামন্ত হলেন। সে কথা লিখতে গৌরবে বক্ষদেশ প্রায় নির্বাচনপ্রার্থী বিশ্বশ্রী মনোহর আইচের বুকের ছাতির আয়তন প্রাপ্ত হচ্ছে। কারণ উপর্যুক্ত আনাকিয়া হিসাব সঠিক প্রমাণ হলে, বর্তমান লেখকও অন্তত এক নয়া পয়সা সামন্ত।

প্রসন্নবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রোহিণীকুমার সেন একটি পারিবারিক ইতিহাস লেখেন। সে বই বেমালুম খোয়া গেছে। ছেলেবেলা পড়েছিলাম। কিছু কিছু মনে আছে। উক্ত ভদ্রলোক বরিশাল জেলার একটি ইতিহাসও লেখেন— নাম 'বাকলা'। বইটি প্রধানত জমিদার বংশগুলির ইতিহাস। সেও লুপ্তপ্রায়। দেশ ভাগ হওয়ার ঠিক আগে কোনও সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে এক কপি 'না বলিয়া' গ্রহণ করেছিলাম। ফলে বইখানা বেঁচে গেছে। এই দুই আকর গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু বক্তব্য রাখছি। যুগোপযোগী ভাষা ব্যবহার করেই চিন্তা হচ্ছে বক্তব্যটা কোথায় রাখছি। গড়িয়ে পড়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কি ? আপাতত সামলে-সুমলে রাখার দায়িত্বটা "দেশ" সম্পাদকের উপর ছেড়ে দিলাম। [এর পর থেকে সজ্ঞানে আধুনিক বাংলা ব্যবহার করলে কথাগুলি উল্টায়িত বা inverted কমার মধ্যে দেব।]

শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই বারো ভুইঞার নাম শুনেছেন। ভুইঞাদের অন্যতম ভূষণার সত্রাজিত রায়। মোগল আমলে তাঁর বংশধরেরা ক্ষিণ্ণপ্রতাপ। তবে মরা হাতীও লাখ টাকা। রায়কাঠির রাজা বলে ইংরেজ আমলে তাঁদের পরিচয়। রোহিণীবাবুর লেখায় এই নামেই তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও যে সময়ের কথা তিনি লিখেছেন, সেটা মোগল রাজত্বের শেষ যুগ, সম্ভবত মুর্শিদকুলী খাঁর জমানা। সম্ভবত, কারণ বৈকুণ্ঠ নামধেয় একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মুর্শিদকুলীর বৈকুণ্ঠ আর বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠে এক বিষয়ে মিল আছে। কোনও দলিল দস্তাবেজে তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। তবে দু-একজন ইংরাজের লেখায় কুলী খানী বৈকুণ্ঠের

বর্ণনা পাওয়া যায়। আর অনেক বাঙালী জমিদার পরিবারে তার স্মৃতি এবং কাহিনী এতই সজীব যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাও হতে পারে।

ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে মোগল শাসনের প্রায় শেষ অধ্যায়ে মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব শাসন ব্যাপারে প্রায় ভেলকি দেখিয়েছিলেন। সুবে বাংলার কোষাগার তাঁর কেরামতির ফলে একেবারে ধনসম্পদে উপছে পড়ছিল। কেরামতির অন্যতম যন্ত্র বৈকুণ্ঠ,— অন্তত লোকপ্রবাদ তাই বলে। মানুষের শরীরকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার বিচিত্র এবং কল্পনাসমৃদ্ধ ব্যবস্থাই বৈকুণ্ঠের বৈশিষ্ট্য। প্রতিষ্ঠানটির নামে সুবাদারি কৌতুকবোধেরই অভিব্যক্তি। পুরীষপুষ্করিণী থেকে তপ্তকটাহ অবধি কোনও কিছুরই নাকি সেখানে অপ্রতুল ছিল না। যে সব জমিদাররা চুক্তিমত খাজনা দিতে নারাজ বা অপারগ, তাঁদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছুকাল বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হত। জনশ্রুতি, যে কখনও কখনও জমিদারের সঙ্গে বা বিকল্পে তাঁর দেওয়ানকে এই রাজকীয় আতিথ্য গ্রহণ করতে হত। কারণ সুবাদারি কানুনে সূর্যাস্ত আইনের মত সরাসরি জমিদারি হস্তচ্যুত করার রেওয়াজ ছিল না। জমিদার এবং তাঁর দেওয়ানকে লিখে কবুল করতে হত যে খাজনা দিতে অপারগ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের অধিকার সরকারকে প্রত্যর্পণ করছেন। তবে এ সবই লোকশ্রুতি, এর মধ্যে কতটা সত্যের গিনি সোনা, কতটা গুজবের খাদ তা বলতে পারব না।

মোগল শাসনের অনির্দিষ্ট কোনও সময়ে— আবারও লিখছি, সম্ভবত মুর্শিদকুলীর আমলে— প্রসন্নবাবুর পূর্বপুরুষ কৃষ্ণকুমার সেন রায়কাঠির রাজার দেওয়ান ছিলেন। এখানে জানিয়ে রাখি, ভূষণার তথা রায়কাঠির রাজবংশের উত্তরপুরুষরা আজও পরিচয়হীন নন। এই বংশেরই অন্যতম সন্তান খ্যাতনামা মনীষী শিবনারায়ণ রায়— এ কথা অল্পদিন আগে জেনেছি। আমাদের বংশে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী মনীষী শিববাবুর পূর্বপুরুষ রায়কাঠি-নরেশ খাজনা দিতে অপারগ হওয়ায় নবাবের হুকুমে কিছুদিনের জন্য বৈকুণ্ঠে চালান হন। জায়গাটা রাজামশায়ের স্বাস্থ্যকর মনে হয়নি, তাই অচিরে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে জমিদারি হুজুরে প্রত্যর্পিত হল এই মর্মে ফার্সী দলিলে তিনি ঢ্যাঁড়া সই মারলেন। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থামল না। কারণ নবাবী শাসনে বাংলা মগের মুল্লুকও নয়, আজাদ হিন্দুস্তানও না। হুজুররা দু-চারটে নিয়ম মেনে চলতেন। লোকসভা না থাকায় দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে দিনকে রাত করার পথ প্রশস্ত ছিল না। অবশ্যি তখন বোফর্স-টোফর্সের দরকার হত না। বাজার খরচা বাবদ দশ-বিশ কোটি টাকার জন্য হঠাৎ ঠেকে পড়লে তা তুলে নেওয়ার অনেক খোলা রাস্তা ছিল, বৈদেশিক সহযোগিতার প্রশ্নই উঠত না, আর এ সব সামান্য কথা নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখির রেয়াজ ছিল না। মোদ্দা কথা, রাজামশাই ত' সই মেরে খালাস, রায়কাঠি দূর্গে কবিরাজের চিকিৎসা এবং রাণীমার শুশ্রূষায় বৈকুণ্ঠবাসের স্মৃতিচিহ্নগুলি রাজদেহ থেকে অপসারণের চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু এবার দেওয়ান মশায়ের ডাক পড়ল। কারণ জমিদারি প্রত্যর্পণের দলিল পুরোপুরি আইনমাফিক হতে হলে দলিলে তাঁরও একটা সই দরকার। দেওয়ান প্রভুর সর্বনাশে 'সামিল' হতে নারাজ। ফলে এবার তাঁর বৈকুণ্ঠবাসের আদেশ হল।

ভদ্রলোকের সহ্যশক্তি কিছু বেশি ছিল। মাস ছয় বিষ্ণুলোকে ইষ্টনাম জপে মুখ খিঁচড়ে পড়ে রইলেন।

একদা নিদাঘকালে কড়া পাকের সন্দেশ খাইয়ে তদন্তে জল না দিয়ে দেওয়ান কৃষ্ণকুমারকে তপ্ত বালুকার উপর ফেলে রাখা হয়েছে। সুবেদার নবাবকার্য সেরে গজপৃষ্ঠে প্রাসাদে ফিরছেন। দেখলেন প্রভুভক্ত দেওয়ান দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নচিত্তে ফুটন্ত বালির উপর দিব্যি সোনামুখ করে পড়ে আছেন। নানা সুকৃতির ফলে রোজ কেয়ামতে আল্লাহ্ তালা তাঁকে কোথায় পাঠাবেন এ বিষয়ে সুবেদার সাহেবের কোনও সন্দেহের কারণ ছিল না। শুনেছেন জায়গাটা বেশ গরম, তাই ধরাপৃষ্ঠে কোনও আদমপুত্রকে অত্যধিক সৌরতাপক্লিষ্ট দেখলে ওঁর একটু এমপ্যাথি* হত। ফলে করুণার্দ্র হয়ে হাওদা থেকে নেমে তিনি সওয়াল পুছলেন। সব শুনে সিদ্ধান্ত করলেন যে প্রভুভক্তি এবং সহ্যশক্তি দুই ব্যাপারেই কৃষ্ণকুমার ওয়ার্লড রেকর্ড ব্রেক করেছেন, যথাকালে গিনেসদের বইয়ে নাম উঠবে। দরাজদিল নবাব তৎক্ষণাৎ খালাসের হুকুম দিলেন। রায়কাঠিরাজও আর রায়কাঠিরাজ্যচ্যুত হলেন না।

এরপর ঘটনা আরও নাটকীয়। কৃতজ্ঞ প্রভু সাশ্রুনেত্রে বললেন, "দেওয়ান কেষ্টকুমার, এ রাজ্য তোমারই। এ তুমিই নাও।" আধ হাত জিভ কেটে নাক কান মুলে কেষ্টবাবু উত্তর দিলেন, "এয়া কয়েন কি, মহারাজ ? তয় আর ছ'মাস বৈকুণ্ঠবাস করলাম কিয়ার লইগগা ?" রাজা বললেন, "তবে আর্ধেক রাজত্বই নেও।" রাজকন্যাটা আর offer করলেন না, কারণ রাজা জাতে কায়েত আর কেষ্টবাবু বদ্যির বামুন। তা ছাড়া ভদ্রলোকের এক বৌ এবং দুই সাবালক পুত্র বর্তমান (অবশ্যি এ সব অকিঞ্চিৎকর জিনিস নিয়ে সে যুগে কেউ মাথা ঘামাত না)। যা হোক, মোদ্দা কথা প্রভুর শরিক হতেও দেওয়ান বাবু নারাজ। তখন মা কালীকে জোড়া মোষের বদলে জোড়া ফড়িং বলি দেওয়ার মত মহারাজ দেওয়ানকে তারই নিজগ্রাম কীর্তিপাশা তালুক দিলেন। দুই পুত্রের নামে সম্পত্তির নাম হল রাজারাম সেন—কাশীরাম সেন তালুক। রাজারামের দশ আনা— বড় হিস্যা (ফার্সী শব্দ হিস্‌সা অর্থাৎ অংশের বঙ্গীকরণ), কনিষ্ঠ কাশীরামের ছ'আনা— ছোট হিস্যা। বর্তমান লেখকের পূর্বপুরুষরা বড় হিস্যার অধিকারী ছিলেন। তাই তাঁদের বংশ এবং বসতবাটি দুইই বড় হিস্যার বাড়ি নামে পরিচিত ছিল।

বাস্তবিক অর্থে বসত বাড়ি একটাই ছিল। দুই হিস্যার মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা যখন বেশ জমে ওঠে তখন এক উঁচু দেয়াল তুলে বার্লিন শহরের মত বাড়িটা দু'ভাগ করা হয়। কিন্তু দুই বাড়ির মাঝখানে দোতলায় একটি ক্ষুদ্রকায় দরজা ছিল, খুললেই দুদিকের লম্বা বারান্দা। সে এক সময় অভিন্ন ছিল বেশ বোঝা যেত। বিজয়া বা অন্য শুভ দিনে সেই দরজা খোলা থাকত এবং তা অসংশয়ে পার হয়ে দুই হিস্যার বালক-বৃদ্ধ-বনিতাদি সবাই পরস্পর জ্ঞাতিসম্ভাষণ করতেন। প্রথাগত প্রণাম, কোলাকুলি, মিষ্টান্ন ভক্ষণ সব

* এমপ্যাথির কোনও যুতসই বাংলা প্রতিশব্দ জানা থাকলে জানাবেন। 'সহমর্মিতা' কথাটা মনে হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজী না জানলে কথাটা বোঝা যাবে না ভেবে ইংরিজি শব্দটাই রাখলাম।

কিছুই হত। বাকি সময় দু'পক্ষের পেয়াদা-লাঠিয়াল লাঠি-সড়কি নিয়ে পরস্পর খুন-জখম করত। আর কাজিয়ার জন্য বিশেষভাবে তৈরি বিশাল বিশাল পেতলের হাতায় ঢিল-পাটকেল মূত্র-পুরীষাদি বার্লিন ওয়ালের উপর দিয়ে উদার হস্তে নিক্ষেপ করা হত। অথ বংশ-তথা-জমিদারি সম্পত্ত্যুৎপত্তি পর্ব সমাপ্ত।

বিঃ দ্রঃ—অত সহজে কি দাদা এ সব গৌরব কাহিনী শেষ হয় ? আমাদের বংশের নিন্দুকদের (আমাদের সমৃদ্ধির কালে এঁদের সংখ্যা স্বভাবতই বেশ পুষ্ট ছিল) মতে উপর্যুক্ত কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা। আসলে নাকি দেওয়ানজি নবাব সরকারে খাজনা পাঠিয়ে পথে লেঠেল দিয়ে টাকাটা লুঠ করান। ফলে শুধু মৌজা কীর্তিপাশা না, অনেকগুলি মহালই রায়কাঠিরাজের হস্তচ্যুত হয়ে কৃষ্ণকুমারের হস্তগত হয়। দেওয়ানবাবুর ধম্মোজ্ঞান কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাই কয়েকটি মহালের জন্য প্রভুকে কিছু খাজনা দিতেন। তাতেই হতশ্রী (শব্দটা অনুগ্রহ করে টেলিভীষণী মহাভারতের মামাশ্রী, বাবাশ্রী, শালাশ্রী, বোনাইশ্রীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলবেন না) সত্রাজিত বংশোদ্ভবদের নাকি কায়ক্লেশে দিন চলত। কীর্তিপাশাধিপতিরা বেশ গুছিয়ে বসেছিলেন। অবশ্যি তাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের খুব সুবিধে হয়নি। কীর্তিপাশার জমিদার ভবনে এখন দ্বাদশ ভূত মৌরসি পাট্টা করে বসেছে। তার অবস্থা মৃণাল সেনের খণ্ডহরের চেয়েও অপকৃষ্ট। আর কৃষ্ণকুমারের বংশাবতংসরা দু-একজন নীরদ বাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষয়িষ্ণু পূর্ববঙ্গ ছেড়ে ডিহি কলকাতা, তারপর শেষোক্ত শহর ক্ষয়িষ্ণু হলে ইন্দ্রপ্রস্থ, অন্তে কালাপানি পার হয়ে ক্লাইভ সাহেবের দেশে আলুসেদ্ধ বাঁধাকপিসেদ্ধ শূয়োরসেদ্ধ খেয়ে পাশ্চাত্যের অবক্ষয় উপলব্ধি করতে করতে শেষের সে দিনের অপেক্ষায় আছে।

আমাদের বংশোৎপত্তি সম্বন্ধে দুই পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তীর কোনটা সত্যি কিংবা কোনওটাই সত্যি কি না জানবার উপায় নেই। বলা বাহুল্য, আমাদের বংশে প্রথম কাহিনীটাই চালু। দীর্ঘদিন ইংরাজদের দেশে থেকে বুঝেছি যে লোকে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে ও বিশ্বাস করতে ভালবাসে। বিদ্যা এবং কলমের জোর থাকলে সেই মিথ্যেগুলি চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে স্যুটবুট পরিয়ে বাজারে ইতিহাস বলে ছাড়া যায়। এ ব্যাপারে ইংরাজদের তুলনায় আমরা নিতান্তই শিশু। তারা অর্ধেক পৃথিবীকে বিশ্বাস করিয়েছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত মহৎ লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান মনুষ্যের ইতিহাসে কখনও হয়নি, হবেও না। তার মহত্ত্ব বুঝতে হলে মহান চরিত্র হওয়া প্রয়োজন। "এয়সা কাম সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে কোই নেহি কিয়া"— ঢাকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় সম্পর্কে জনৈক বিবসন সাধুর এই উক্তি আসলে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। যে সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হত না, সেটা না কি শুধু ধর্মযুদ্ধের পথে আইনসম্মতভাবে আহরিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে ত' ওঁদের একেবারেই রুচি ছিল না। "আরে কি করেন, কি করেন" বলে ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংস উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তবু ওঁদের ওজর আপত্তি না শুনে দেশটা আমরা পাতে ঢেলে দিলাম। তারপর আর কি করা যায়, নেহাত চক্ষুলজ্জায় পড়েই...

এ সব কথা ক্ষেমাঘেন্না করবেন না। এগুলি গবেষণামূলক বস্তুভিত্তিক

বিশ্লেষণী ইতিহাস। তা হলে লেখকের পূর্বপুরুষ দেওয়ান কৃষ্ণকুমার সেন প্রভুভক্ত সন্তপুরুষ ছিলেন এ কথা মানতেই বা দোষ কি ?

সত্যিতে দেওয়ানজির সঙ্গে লেখকের কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। কারণ আমাদের বংশে অন্তত দুবার দত্তক নেওয়া হয়। লেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজকুমার সেন এবং প্রপিতামহ প্রসন্নকুমার দুজনেই পুষ্যি পুত্তুর। তাঁদের বাপপিতামহ দেওয়ান ফেওয়ান কিছু ছিলেন না, নিতান্তই ছা-পোষা গ্রাম্য গেরস্ত। সুতরাং তাঁদের নামধাম বংশলতিকার* খবর কেউ রাখেনি। দেশভাগের পর কলকাতার এঁদো গলিতে অন্ধকার ফ্ল্যাটে বসে যখন অর্ধোন্মাদ বাড়িউলির গালিগালাজ শুনতে হত, তখন সেই পরিচয়হীন গরিব পিতৃপুরুষদের সঙ্গেই একাত্ম বোধ করতাম। বরিশালের বাংলো বাড়ি, কীর্তিপাশার জমিদারভবন নিতান্তই অবান্তর interlude মনে হত। ভাবতাম এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছি, উপরি পাওনার মধ্যে স্বাধীনতার দান,— বিচিত্র হেনস্তা এবং এমন সব লাঞ্ছনা-অপমান যা গ্রামের ভদ্রজনের জীবনে দুঃস্বপ্নেও দেখা দেয় না।

AMARBOI.COM

* বাঁশের লতা কেউ কখনও দেখে থাকলে জানাবেন।

রোমাঞ্চক/ রোমহর্ষক* ইতিহাস

কীর্তিপাশা গ্রামে ছিল বাবু রাজকুমার
তার কীর্তি যত বলব কত হোনতে[১] চমৎকার ॥
আহা, হোনতে চমৎকার ।
হ্যার[২] দেওয়ান ছিল কুলাঙ্গার ষোড়শী মওলানবীশ ।
সরবতে মিশাইয়া দিল হলাহল বিষ
হালা[৩] হারামজাদা ।
হা-আ-লা হারামজাদা আলো চাইল্যা[৪] বাওন[৫]
মাগগো চিরিয়া[৬] বাইর কর হ্যার ঘেরতে,[৭] চিনি, মাহোন[৮] ।
হালা হারামজাদা ।

পশ্চিমবঙ্গানুবাদ : [১]শুনতে [২]তার [৩]শালা [৪] আলোচেলে— আতপান্নভোগী [৫]ব্রাহ্মণ [৬]চিরে [৭]ঘৃত [৮] মাখন

টীকা : রাজকুমার সেনের অপমৃত্যু বিষয়ে রচিত এই বীর-তথা-করুণ রসাত্মক লোকগীতি বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও বহুপ্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, শৈশবে বহুশ্রুত এই গানটির কয়েকটি পদ ভুলে গেছি। চারণ কবি মূল গীতে দুই শালা হারামজাদার উল্লেখ করেন। প্রথম হারামজাদা রাজকুমার বাবুর দেওয়ান বৈদ্যবংশীয় মহলানবীশ মশায়। (তাঁর পিতৃদত্ত তিন অক্ষরযুক্ত আসল নামটি চেপে গেলাম, কারণ তাঁর উত্তরপুরুষ আজও জীবিত, লেখকের আত্মীয়স্থানীয়।) দ্বিতীয় হারামজাদা জাতিতে ব্রাহ্মণ, রাজকুমার সেনের গুরু। রোজ সকালবেলা জমিদারের পেয় সরবত গুরুদেবের সামনে রাখা হত। করুণাময় গুরু সরবতে দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি চোবাতেন। সেই পুণ্যস্পর্শে পানীয় পাদোদকে পরিণত হত, শিষ্য তা' অমৃতজ্ঞানে গ্রহণ করতেন। জনপ্রবাদ— দেওয়ান আর গুরু সড় করে

* আবার ফুটনোট। যাতে গায়ের লোম উঁচু হয়ে ওঠে তা রোমাঞ্চক। কিন্তু যাতে গাত্ররোম হেসে ওঠে তার গতিপ্রকৃতি কি ? কিন্তু এই অকল্পনীয় বিশেষণটি এমনই কল্পনাদ্যোতক যে বিকল্প বিশেষণ হিসাবে শিরোনামায় ব্যবহার করার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

সরবতে বিষ মিশিয়ে রাজকুমার সেনের প্রাণনাশ করেন। লুপ্ত পংক্তিকটিতে মহলানবীশ বাবু না, 'আলো চাইল্যা বাওন' অর্থাৎ আতপান্নভোজী ব্রাহ্মণ হারামজাদার অবদানই বর্ণিত ছিল। উধৃত শেষ দুটি পংক্তিতে চারণকবি তাঁর বিক্ষুব্ধ মূল্যবোধ বা moral indignation বরিশালবাসীর সহজাত সম্পূর্ণ অস্পষ্টতাবর্জিত মহাবলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য— এই কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ দীর্ঘদিন শিষ্যের দান গ্রহণ করেছেন, অপরিমিত 'ঘেরতো, চিনি, মাহোন' তাঁর উদরস্থ হয়েছে। জনগণের রায়, ক্রূরকর্মার উচিত শাস্তি তাঁর প্রত্যঙ্গবিশেষ বিদীর্ণ করে সেইসব সুভক্ষ্য পুনরুদ্ধার করা। অবশ্যি আজাদ হিন্দুস্তানে যোজনা-সংস্থার উপদিষ্ট ব্যবস্থার মত কবির এই নির্দেশও কার্যে পরিণত হয় নি। সেই যুগে বরিশাল জেলায় বিপ্লবী চীনের আদর্শে গণ-আদালত ছিল না। থাকলে ব্রাহ্মণের উপর্যুক্ত প্রত্যঙ্গ নিস্তার পেত মনে হয় না।

গুরু ও দেওয়ানদত্ত বিষ খেয়ে রাজকুমার বাবু ত' স্বর্গে গেলেন। এখন তাঁর সহধর্মিণী অনুমৃতা হবেন বলে জিদ ধরলেন। ভদ্রমহিলা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি যাঁরা হিন্দুগৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের স্বামীর চিতায় রোস্ট করে সতীমাতা বানাবার ব্যবস্থা দিচ্ছেন তাঁদের খুব দেলপসন্দ হবে। গল্পটা সেই মহাত্মাদের ক্ষুরেই নিবেদন করছি।

শোনা যায়, রাজকুমার-পত্নীকে নিরস্ত করার চেষ্টায় তরুণ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং কীর্তিপাশা আসেন। এসব ক্ষেত্রে যা যা ঘটত বলে ঐতিহ্যগর্বী হিন্দুকুলপুংগবরা বিশ্বাস করতে ভালবাসেন, তার সবই নাকি যথানিয়মে ঘটেছিল। অর্থাৎ হাতার বদলে হাত ব্যবহার করে পায়সান্ন রন্ধন, সাহেবকে তাঁর মেমসাহেবের স্বাস্থ্য বিষয়ে কুশলপ্রশ্ন করতে করতে প্রদীপের আগুনে হাসিমুখে নিজ তর্জনীদাহন ইত্যাদি বিচিত্র বীরত্ব দেখিয়ে ভদ্রমহিলা নাকি প্রমাণ করেন যে তিনি বাপের বেটি বটেক। তিনি সাধ্বী হিন্দু স্ত্রী। এই মরদেহটা তাঁদের কাছে নিতান্তই তুশ্চু (বিশ্বাস না হয় ত সাধু হিন্দু পুরুষদের জিজ্ঞেস কর, যদিও তাঁরা সাধারণত সজ্ঞানে চিতায় ওঠেন না, দু' চারটে মসজিদ ভাঙতে উস্কানি দিয়েই ধর্মকৃত্য সমাধা করেন)। সতী নারীর তেজ তুই মেলেচ্ছ ছোঁড়া কি বুঝবি ? তোর মার তিন, ঠাকুমার পাঁচ বিয়ে। সাহেব হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "মাদাম, আপনার ঐ পাঁচ বছরের প্যাঁকাটিমার্কা ছেলেটার কি হবে ?" দেবেন ঠাকুরের ঠাকুমার মত আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বুঝিয়ে দিলেন,— সে দায়িত্ব নভোস্থিত বাবার, তোরা যাকে বলিস তোদের Father in Heaven. সাহেব একবার শেষ চেষ্টা করলেন। আকাশের বাবা যে তাঁর স্বামীর ক্ষেত্রে একটু বেখেয়াল হয়েছিলেন এবং কুলোকে বলছে যে তাঁর লোকাল এজেন্টটিই ভদ্রলোককে প্রভুর চরণে পৌঁছে দিয়েছেন— সে সব উল্লেখ করলেন। তারপর দেওয়ানাদি যে সব বিশ্বাসী লোকজন আছেন তাঁরাও কি আর মওকা পেলে সম্পত্তিবান অনাথ ছেলেটাকে অমনি ছেড়ে দেবেন ? কিন্তু কাকে কে বোঝায় ? যথাকালে টকটকে লাল বেনারসী, এক গা হীরে-জহরতের গয়না, এক কপাল সিঁদুর পরে বিয়ের কনে সেজে বাপের বেটি চিতায় উঠলেন। ওঠার আগে অবশ্যি গয়নাগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে সইদের দিয়ে দিলেন। লোকে ধন্য ধন্য করল। চিতানলে পবিত্র হয়ে সতীনারী বেহেস্ত গেলেন।

সেখানে অনন্ত যৌবন, নিরবচ্ছিন্ন স্বামীসহবাস। * সতীর নামে মন্দির উঠল। তাঁরই পুণ্যে নাকি উত্তরপুরুষরা বেঁচে বর্তে আছি। তা হবে। আঠার-উনিশ বছরের সহায়হীনা মেয়েটিকে কোন্ বজ্জাতমণ্ডলী কি চাল খেলে কতটা আফিঙ খাইয়ে আগুনে তুলে দিয়েছিল এই পুণ্যকথায় তার কোনও উল্লেখ নেই। এ সব অবান্তর কথা এই জাতীয় কাহিনীতে সাধারণত পাওয়া যায় না। অন্যথায় হিন্দুর জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হত।

মা ত গিয়ে ইন্দ্রসভায় বাবার পাশে রত্নসিংহাসনে বসলেন। এদিকে অনাথ প্রসন্নকুমারের নিতান্ত বেহাল। চারপাশে ষড়যন্ত্রী। তাদের সর্বদাই জিভ লক্‌লক্, আনাচে-কানাচে উঁকি। একমাত্র বিশ্বাসী ভৃত্য রাজু ভাণ্ডারী বড়হিস্যার বাড়ির নিভু নিভু সলতেটিকে কোনও মতে দু'হাতে আগলে রেখেছে। জনপ্রবাদ, শত্রুরা বিষ দেবে বলে রোজ হোমিওপ্যাথিক ডোজে একটু-একটু বিষ খাইয়ে রাজু শিশু প্রসন্নকুমারকে de-sensitise করে দিল,— মানে আজকাল যেভাবে এলার্জির চিকিৎসা করা হয় সেইভাবে। শেষে নাকি প্রসন্নবাবুকে গোখরো সাপে কামড়ালে সাপটাই মরে যেত। আরও গুজব যে প্রসন্নবংশাবতংসদেরও আশৈশব অল্প অল্প বিষ খাইয়ে গুরুকৃপার জন্য প্রস্তুত রাখা হত। লেখকের ভগ্নীস্থানীয়া এক বরিশালকন্যা এক সময় প্রায়ই প্রশ্ন করতেন, "আপনি কতটা বিষ খেয়ে হজম করতে পারেন?" দেশে এবং বিদেশে দীর্ঘকাল কলেজ হস্টেলে বাস করেছি। সুতরাং, অনেকটাই পারি, সন্দেহ নেই। গোখরো সাপটাপ না, একবার একটা ছুঁচো কামড়ে ছিল। (বিশ্বাস করুন, মুখ ছুঁচোলো হলেও ওদের কামড়াতে কোনও অসুবিধে হয় না।) পরদিন দেখি, ওটা আকাশের দিকে চার পা তুলে পড়ে আছে, বোধ হয় মরেই গিয়েছিল। সমাধিস্থ হলে চরণকমল ভূমিস্পর্শ করে থাকত। এ প্রসঙ্গে ভূয়োদর্শনের একটি মূলতত্ত্ব নিবেদন করি। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করলে দ্বিপদ ছুঁচোর কামড় থেকে নিষ্কৃতির কোনও পথ নেই। আর পাঁচজনের মত আমাকেও যথাভাগ্য সে কামড় খেতে হয়েছে। বিশেষ কোনও অনিষ্ট হয়নি,—সম্ভবতঃ রাজু ভাণ্ডারীর দূরদৃষ্টি এবং প্রসন্নজননীর অর্জিত পুণ্যের ফলে।

এসব অবান্তর কথা এখন থাক।

রাজু ভাণ্ডারীর আকৃতি সত্ত্বেও প্রসন্নকুমারের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার ক্রমেই ঘনিয়ে আসছিল। বিষপ্রয়োগই নরহত্যার একমাত্র উপায় না। রাজু preventive medicine হিসাবে শিশুকে বিষ অভ্যেস করাচ্ছে দেখে শুভার্থীরা অন্য পন্থা খুঁজতে লাগলেন। এর পরের নাটকীয় কাহিনীটা শুনলে গাত্ররোম হর্ষোৎফুল্ল হয় বটে, কিন্তু ওটা সর্বৈব মিথ্যা তার প্রমাণ আছে। গল্পটা এই। একদিন রাজু জানতে পারল— কল্যই শেষ রজনী। সেদিন অমাবস্যা, অন্ধকার as usual সূচীভেদ্য, আকাশে ঘনঘটা, বিদ্যুতের আলো ছাড়া পথ চেনার উপায় নেই। তা' ছাড়া অত খালবিলের দেশে পথই বা কোথায়? সব বিঘ্ন তুচ্ছ করে প্রভুভক্ত রাজু শিশু প্রসন্নকে কোলে নিয়ে জেলা শহর

* সে আমলে লোকের সখটখ একটু বেশী ছিল। সহজে bored হত না।

বরিশালের দিকে 'হাডা মাল্লে' অর্থাৎ হাঁটতে শুরু করল। বসুদেব যেমন শিশু কেষ্টকে কাঁখে করে বেন্দাবন পৌঁছেছিলেন রাজুও তেমনি ষোল মাইল হেঁটে অনেক মকর-কুম্ভীর তথা চ্যাং-ব্যাং অধ্যুষিত খালবিল পার হয়ে প্রসন্ন সহ বরিশাল পৌঁছলেন। পৌঁছে সোজা কালেক্টর সাহেবের বাংলো এবং সেখানে সাহেবের বুটপদ্মে উপুড় হয়ে পতন।

এখানে একটা ঐতিহাসিক সত্য সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত হতে বলি। সাহেব ভিন্ন বাঙালীর গতি নেই, বাঙালির ইতিহাসের এটি একটি প্রধান এবং মূলীভূত তত্ত্ব। অক্ষয় দত্ত থেকে নীরদ চৌধুরী ইস্তক অনেকানেক মহাত্মার লেখায় এ বিষয়ে ভূরিভূরি অকাট্য প্রমাণ আছে। এই সত্য যে বাঙালীর অন্তরে তথা অবচেতনে কত গভীর ভাবে প্রবেশ করেছে, কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অনুষ্ঠানে তারও এক অকাট্য প্রমাণ পাই। জনৈক বিখ্যাত বাঙালী গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা করছিলেন : "সে-এদিইন এ-এক তরু-উণ* এই কলেজে ভর্তি হতে এসেছিল। কিন্তু প্রবেশের ছা-আ-ড়-প-অত্র তার মেলে-এ নিই। তার অপরাআধ— সে দেশকে ভালবা-আ-সত। [টিকা : আসল অপরাধ, সে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল।] সাহেব প্রিন্সিপাল জানালেন,— সরকারি কলেজেএ দেএশভক্তর স্থান নেই। [টিকা : নেতাজী সুভাষচন্দ্র আদি দু-দশজন ছাড়া।] তখন সেই তরুউণ দেশপ্রেমে উন্মাআআদ হয়ে মহাত্মা গাঁধীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। গাঁধীজির পায়ে প্রণাম করে সে বলল, "সাহেব..."। প্রচন্ড হাততালিতে বক্তব্য আর এগুতে পারল না।

আসল কথায় ফিরি। আমাদের পরিবারেও অবশ্যম্ভাবী ভাবে সাহেবই বাঙালীর প্রাণরক্ষা করলেন। রাখে সাহেব মারে কে? প্রভুভক্ত রাজু ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে শিশু প্রসন্নকে সমর্পণ করে কীর্তিপাশা প্রত্যাবর্তন করলেন।

আগেই লিখেছি— এই জমকালো পারিবারিক কিংবদন্তীটি সম্পূর্ণ গাঁজাখুরি গল্প। রোহিণী বাবুর লেখা "বাকলা"য় তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট রেলী সাহেবের এক লম্বা চিঠি উদ্ধৃত আছে। তা থেকে জানা যায় যে সাহেব কীর্তিপাশা গ্রামে সরেজমিন তদন্ত করতে যান। প্যাঁকাটির মত রোগা প্রসন্নকুমারকে দেখে শুভার্থীদের হাত থেকে তাকে বাঁচানর ব্যবস্থা করেন। রাজুর রোমহর্ষক নৈশ অভিযানটি কীর্তিপাশাবাসীদের বলিষ্ঠ কল্পনার স্মারক।

যা হোক, শিশু প্রসন্ন কালেক্টর সাহেবের ঘরে দিনে দিনে মানুষ অর্থাৎ সাহেব হতে লাগলেন। অশ্বারোহণ, জমিদারি পরিচালন, ইংরাজি বলন, টেবিলে ভোজন, কমোডে অবশ্যকৃত্যকরণ, তদন্তে হাগজ** ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় আবশ্যক বিদ্যা তাঁর রপ্ত হল। কিন্তু দয়াময় সাহেব নাকি তাঁকে

* বলা বাহুল্য তরুণটি বক্তা স্বয়ং। ভবভূতির যুগ থেকে গিরীন্দ্রশেখর বসু-রচিত লালকালোর গুণী পিপিলিকা বিশের ব্যাটা বেয়াল্লিশ অবধি নিজের পায়ে নিজে তিনবার প্রণাম করার ঐতিহ্য অস্মদ্দেশের মত আর কোথাও নেই।

** বন্ধুবর নিমাই চট্টোপাধ্যায়কৃত toilet paper-এর এই পরিভাষা তাঁর বিনানুমতিতেই পাঠিকা-পাঠকদের উপহার দিলাম।

নেটিভ ভাষা শেখানোর কোন ব্যবস্থা করেননি। অথচ ১৮ বছর বয়সে মনুস্মৃতি এবং দেশাচার অনুযায়ী তাঁকে ষষ্টিপ্রিয়া দেবী নাম্নী এক ছয় বছরের বালিকার সঙ্গে বিয়ে দেন এবং নাবালক বাবু সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বিবেচনা করে সম্পত্তি তাঁর হাতে সমর্পণ করেন।

ষষ্টিপ্রিয়া ছিলেন যাকে বলে রীতিমত তেজস্বিনী। মানে, আমাদের বংশে যে কোনও মেয়ের দজ্জাল বনার লক্ষণ দেখা দিলে গুরুজনরা বলতেন, ষষ্টিপ্রিয়া ঠাকরুণ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর বড় ছেলে রোহিণীকুমারের তোলা ঠাকরুণের প্রৌঢ় বয়সের ফোটো আমরা দেখেছি। দেখে জাঁদরেল শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। শব্দটার উৎপত্তি ইংরাজি জেনারেল থেকে। কোনও গুম্ফধারী জঙ্গীলাট শাড়ি পরলে ষষ্ঠিপ্রিয়া দেবীর চেয়ে বেশী ভীতিসঞ্চারক হতেন মনে হয় না।

সাহেবায়িত প্রসন্নকুমারের দাম্পত্যজীবনের গোড়াটা সুখকর হলেও স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল মনে হয় না। কারণ প্রারম্ভেই ষষ্ঠিপ্রিয়া তরুণ স্বামীর ঘাড় থেকে ম্লেচ্ছের ভূত নামাতে যত্নবতী হন। টেবিল ছেড়ে পা মুড়ে পিঁড়িতে বসে খাওয়া এবং বাংলাভাষা বলা বেচারিকে অচিরে রপ্ত করতে হয়। কোন্ মন্ত্রবলে ছ-সাত বছরের মেয়ে এই সব অসাধ্য সাধন করেছিলেন, আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। তবে তাঁর পরবর্তী জীবনের কীর্তিকলাপ বিষয়ে কিছু কিছু কিংবদন্তী থেকে তাঁর তেজবিক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। শোনা যায়, যখন তিনি বৈধব্যদশায় নাবালক সন্তানদের সম্পত্তি দেখাশুনা করছেন, সেই সময় কোনও হঠকারী গ্রামবাসী বাজারে এক দোকানের দাওয়ায় বসে তাঁর কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করে। কথাটা অবিলম্বে চৌধুরাণীর কানে পৌঁছায়। সমালোচকের মুন্ডুটি পরদিন সকালে বাজারের রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছিল। দেহের বাকী অংশ সম্ভবত অন্যত্র কোথাও ছিল।

AMARBOI.COM

নিজ মৌজা কীর্তিপাশা

জমিদারি সেরেস্তার লাল খেরোয় বাঁধান লম্বা লম্বা হিসাবের খাতাগুলির উপর দুর্বোধ্য আধা ফারসী ভাষায় নানারকম বিষয়বর্ণনা লেখা থাকত— মোটা করে কালো কালি দিয়ে কতকটা পুঁথির ছাঁদের অক্ষরে। বয়ানে উসুল জমা, নকলে পাট্টা, কবুলিয়তে মহাল শিবপুর ইত্যাদি ইত্যাদি। মুহুরি-সরকার-খাজাঞ্চিদের বিরক্তি অগ্রাহ্য করে এই সব খাতা ঘেঁটে ছুটির দিনের অনেকটা সময় কেটে যেত। বয়স্কদের কাছে এই সব রহস্যময় বাক্যের অর্থ জানতে চেয়ে সদুত্তর পাওয়া যেত না। সেরেস্তার কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলে সব সমস্যার সেই শেষ এবং অনন্য সমাধান সদুপদেশ হিসাবে বর্ষিত হত, "বড় হইলে বোZবা।" যথাকালে সম্ভবত বড় হয়েছি, কিন্তু বোZার ব্যাপারটা বেশীদূর এগোয় নি কোনও ক্ষেত্রেই। জমিদারি হিসাবের খাতা থেকে সুরু করে মানবজন্মের দুরূহতর রহস্যগুলি পর্যন্ত সবই প্রায় বুদ্ধির বাইরে রয়ে গেছে।

সেই খেরোয় বাঁধা খাতাগুলির মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা ব্যঞ্জনাময় শিরোনাম চোখে পড়েছিল— নিজ মৌজা কীর্তিপাশা। মৌজা শব্দটা নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। 'নিজ মৌজা কীর্তিপাশা'—এই শব্দসমষ্টি কিন্তু নিতান্তই নতুন। অর্থ করলাম— এই কীর্তিপাশা গ্রাম আমাদের, তথা আমার এবং কোনও বিশেষ ব্যাখ্যাতীত অর্থে আমরা, তথা আমি, এই গ্রামটির একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ আমাদের রাষ্ট্রচেতনাসমৃদ্ধ জেলাশহরটিতে এর আগেই এসে পৌঁছেছিল। রাস্তায় তেরঙ্গা ঝান্ডা নিয়ে মিছিল, আকাশে বাতাসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি, বাড়ির পাশেই পুলিশ হাজতে শিকের দরজার পিছনে চেনা-অচেনা অনেকগুলি মুখ, দীর্ঘ অনশনের পর তরুণ বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুতে শহরময় বিষণ্ণ উত্তেজনা, খবরের কাগজে তাঁর মৃত শীর্ণ অবয়বের অস্পষ্ট ছবি — এই সব মিলিয়ে দেশ বলে একটা সত্ত্বা অতি শৈশবেই আমাদের চেতনার অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে দেশ ভারতকথার সহস্র যোজন জোড়া জম্বুদ্বীপ, মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্রের নামে তার নাম, বিক্রমাদিত্য থেকে শাহেনশাহ আকবর অবধি বিরাট পুরুষরা তার চক্রবর্তী সম্রাট, প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ তার অত্যাচারী বিজেতা। ত্রিশ কোটি মানুষ হাতে

খরকরবাল তুলে নিয়ে একদিন সে অত্যাচারের অন্ত ঘটাবে। তাদের নতুন রাজা গান্ধী মহারাজ। তাঁকে ক্যালেন্ডারের ছবিতে কল্কিরূপে অসি হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে ঘোর যুদ্ধে নেতৃত্ব করতে দেখা যায়, যদিও সে ছবিতেও তাঁর পরনে বর্মচর্মর বদলে হাঁটু অবধি ধুতিই চোখে পড়ে। আমরাও সেই মহারাজের ক্ষুদ্রকায় সৈন্য, এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। চরখা চালিয়ে বা পিস্তল ছুঁড়ে একদিন সেই সৈন্যকৃত্য করতে হবে। "যায় যাবে জীবন চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।" কিন্তু সেই বীরগতির স্বপ্নের মত, রবি কবির ভারততীর্থ আর পাঠ্য বইয়ে দেখা ভারতবর্ষের ম্যাপও প্রাক্-বয়ঃসন্ধি রোমাঞ্চকর কল্পনার অঙ্গ। তার সীমারেখা অস্পষ্ট, তার নদী-পর্বত-অরণ্যর গম্ভীর ধ্বনিময় নামগুলি এক বিচিত্র গর্বের বস্তু। কিন্তু রোজকার পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে সেই বিরাট বিশাল দেশের যোগসূত্র কিছুটা দুর্বল। অপরিণত মনের আবেগ দিয়ে সে সূত্রকে দৃঢ় করতে হয়।

কিন্তু 'নিজ মৌজা কীর্তিপাশা'? নিতান্ত বিষয় সম্পত্তি ঘটিত এই বর্ণনার কাব্যরস সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ণিত ভৌগোলিক সত্ত্বাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ বুঝতে উপমহাদেশব্যাপী আন্দোলন বা মহাকবির প্রতিভার শরণ নিতে হয় না।

আমরা বছরের বেশীর ভাগ সময়টা কাটাতাম জেলা শহরে। পূজার মাসটা এবং কখনও কখনও অন্য প্রয়োজনে কয়েকটা সপ্তাহ গ্রামে থাকা হত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নানা সমালোচনায় এক জাতীয় লোককে অনেক সময় প্রধান অপরাধীর ভূমিকায় খাড়া করা হয়। তাঁরা হলেন প্রবাসী জমিদার,— absentee landlords। যদিও বরিশাল শহর কীর্তিপাশা গ্রাম থেকে মাত্র ষোল মাইল পথ এবং বাবা-জ্যাঠারা কখনও কখনও সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন, তবু আমাদের পরিবারও যে সেই অপরাধীর দলে পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

AMARBOI.COM

কিন্তু অধিকাংশ সময় শহরের যে বাড়িটায় কাটত, কথ্য ভাষায় তার নাম ছিল বাসা। অর্থাৎ সেই বাসস্থল পাখির নীড়ের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর পিতৃপুরুষের তৈরি গ্রামের বাড়িটাই বাড়ি, যেখানে উত্তরপুরুষ অনন্তকাল বাস করবে।

নদী ছেড়ে ঝালকাঠি বন্দর থেকে বাসণ্ডা-কীর্তিপাশার খাল ধরে বজরা, কোশ নৌকা বা মোটর বোটে বড়হিস্যার বাড়ির ঘাটে পৌঁছতাম। পৌঁছে প্রথম গন্তব্যস্থল পূর্বপুরুষের বাস্তুভিটা। সে ভিটার ভিত, মেঝে, দেয়াল সবই মাটির, ছাউনি খড়ের। দেওয়ান কৃষ্ণকুমারের পূর্বপুরুষ বিক্রমপুর থেকে এসে এইখানে ভিত গেড়ে বৈদ্যর জাতব্যবসা অর্থাৎ আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। মাটির ভিত কতদিন টেঁকে জানি না, কিন্তু ঐ একই জায়গায় যে তিন-চারশ' বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করেছেন এই জনপ্রবাদ বোধহয় সত্যি। মাটির দেয়াল আর খড়ের ছাউনি অবশ্যই বারবার ভাঙ্গাগড়া হয়েছে। তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল যে ঐ অকিঞ্চিৎকর মালমশলায় তৈরি সামান্য বাসস্থানটি ঘিরে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ রয়েছে, বিপদে আপদে সেই আর্শীবাদ আমাদের রক্ষা করে।

বাস্তুভিটায় ধুতি টেনে পা মুড়ে বসতে হত, যাতে পুরুতঠাকুরের ছোঁটান

পবিত্র শান্তিজল পায়ে না ঠেকে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের প্রণাম করতে হত, আড়চোখে দেখতাম আমার নাস্তিক বাবাও হাত জোড় করে মাথা নোয়াচ্ছেন। পুরুত ঠাকুর নেহাতই বাঙালি সংস্কৃতে অর্থাৎ শূদ্রের উচ্চারণে ষত্ব-ণত্বর বিধান না মেনে আমাদের উর্ধতন চতুর্দশ পুরুষের আত্মার কল্যাণ কামনা করতেন। 'চ' অক্ষরটি চ এবং ছ-য়ের মাঝামাঝি এক অলেখ্য ব্যঞ্জণবর্ণে পরিণত হত।

এই ভিটা যিনি স্থাপন করেন, তিনি সঙ্গে করে এক শালগ্রাম শিলা এনেছিলেন। সেই কালো গোলাটে পাথরটির গায়ে একটি ছেঁদা, সেই ছেঁদার ভিতর উঁকি দিলে বিষ্ণুচক্র দর্শন হয়, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলে যায়। পুরুত ঠাকুর পাথরটি চোখের কাছে ধরতেন, স্পষ্ট দেখতাম বন্‌বন্ করে সুদর্শন চক্র ঘুরছে। অল্পদিন আগে শিশুপালের কাহিনীটা শুনেছি। তাই সুদর্শন চক্র সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদী হওয়া নিরাপদ মনে হত না। ভয়টা আরও বেড়ে যেত জ্যেঠতুত দাদা কালুদার কুশল প্রশ্নে, "চক্‌কর্ দ্যাখছো ?" উত্তর, "হ"। কর্মফল সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। বিষ্ণুচক্রের অন্যতর কাজ দুষ্কৃতকারী বালকদের শিশ্নাদি অঙ্গচ্ছেদ, — একথা তিনি সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। মানবদেহ সম্বন্ধে বরিশালবাসীর দ্বিধাহীন মনোভঙ্গীর কথা প্রথমেই বলেছি। বালকদের কুশলপ্রশ্ন করার কাজটা গ্রামবৃদ্ধরা বেশ খুঁটিয়ে সম্পন্ন করতেন। প্রথম প্রশ্ন হত, "বাসো কেমন ?" (অর্থাৎ কেমন লাগছে ?) দ্বিতীয় প্রশ্ন, "— ডা কেমন ?"

বাস্তুভিটা অনুষ্ঠান শেষ হলে চকমিলানো জমিদার ভবনে প্রবেশ, প্রতিবার গ্রাম ছাড়ার সময় শেষ কৃত্য আবার এই ভিটায় এসে পূর্বপুরুষকে প্রণাম। শেষবারের মত নিজ মৌজা কীর্তিপাশায় বাস চুকিয়ে যেদিন চলে আসি সেদিনও নৌকায় ওঠার আগে শেষ কাজ ছিল বাস্তুভিটায় পূর্বপুরুষদের প্রণাম।

কীর্তিপাশার জমিদারবাড়ি কবে তৈরি আমাদের জানা নেই। মাত্র কয়েক আঙুল উঁচু অথচ বেশ চওড়া ইটের গাঁথুনি দেখে মনে হত, আঠার শতকের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি এই বাড়ির পত্তন। সেকেলে আর পাঁচটা বাড়ির মত এটাও একদিনে তৈরি না। পূর্বপুরুষরা খেয়ালখুশিমত বাড়িয়েছেন, অদলবদল করেছেন। বাড়ির সামনের মাঠে এক পাশে সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি অর্থাৎ মন্দির। দেবীটি কালো পাথরের, সম্ভবত বেশ প্রাচীন। মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী জোড়বাংলা ধরনের, ইটের গাঁথুনির উপর পলেস্তারা। মন্দিরের সামনে নিত্যস্থায়ী হাড়িকাঠ,— সেবকদের শাক্তধর্মে মতির চিহ্ন। সেখানে অনেক পাঁঠা-মোষ অনিচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়েছে। কল্পনাপ্রবণ গ্রামবাসীরা নীচু গলায় বলতেন,— ওখানে যারা বলি হয়েছে তাদের সকলেই চতুষ্পদ নয়।

মন্দির থেকে একটু দূরে "পুশকোরণী" বা "পুহোইর" অর্থাৎ পুকুর, যেখানে গুরুজনের উষ্মা উৎপাদন করে 'পোলাপানে হারাদিন চুবায় আর ঘোৎলায়'। পোলাপান অর্থ বালকবালিকা। 'হারাদিন' প্রুস্ত সাহেবের time past না, সারাদিন, "ঘোৎলায়" onomatopoeia-র উদাহরণ, ধ্বনিতেই শব্দার্থ প্রকাশ, প্রতিশব্দর প্রয়োজন নেই। স্নেহের আধিক্য হলে গুরুজনরা বলতেন,

"হুয়ারডার [শূয়ারডার] মত ঘোৎলায়" ।

পুকুরের তিনটি ঘাট । প্রধান ঘাটের উপর ছাউনি বাঁধা, তারও উপরে এক জামরুল গাছের সুদূরপ্রসারী শাখাপ্রশাখা । মফস্বল শহরে সিনেমায় টারজানের ছবি দেখার পর কেউ কেউ অমানবিক ধ্বনি তুলে সেই ডাল থেকে পুকুরে লাফিয়ে পড়ত । সহনশীল গুরুজনেরা স্মিতমুখে মাথা নেড়ে বলতেন, "পোলাপান অসতের ভাণ্ড ।" অর্থাৎ শিশুকুল যাবতীয় অকর্তব্যের আধারস্বরূপ । **প্রশ্ন— শিশুকৃত অকর্তব্য আর কতদূর যায় ?**

বড় হিস্যার বাড়ি অতি পরিচিত হয়েও অপরিচিত । তার রহস্যর শেষ নেই । দুটো চক ঘিরে দোতলা দালান । সামনের চকে একতলায় মাঠের মুখোমুখি এক সারি ঘর । সেখানেই কাছারি এবং কিছু কিছু কর্মচারীর বাসস্থান । দুপুরে খাওয়ার পর দিবানিদ্রার সময় । কাছারি তখন জনহীন । ভেজান দরজা খুলে ঢুকতে কোনও বাধা নেই । সেই আধা অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরগুলিতে ঢুকলে অকারণেই গা ছমছম করত ।

কিন্তু সত্যিকার ভয়ঙ্কর মাটির নিচের আন্ধারিয়া কোঠা অর্থাৎ অন্ধকার প্রকোষ্ঠ । সেখানে সূর্যের আলো ঢোকে না । এই সব ঘরে নাকি এক সময়ে শত্রুপক্ষের লেঠেল এবং অবাধ্য প্রজাদের গুম করা হত । মশালের আলোয় দেখা যেত দেয়ালে বিচিত্র চেহারার সব অস্ত্রশস্ত্র ঝুলছে—ল্যাজা, বর্ষা, রামদা, খড়্গ ইত্যাদি প্রাক্-শিল্পবিপ্লব নানা মানুষ মারার যন্ত্র । মহাভারতে পড়া শেল, শূল, ভিন্দিপাল ইত্যাদি নামগুলির সঙ্গে এদের চেহারা মেলাবার চেষ্টা করতাম । তিনটে বীভৎস চেহারার বাঁকা বাঁকা ফলাওয়ালা বল্লম জাতীয় একটা বস্তু দেখে স্থির করি এটা ভিন্দিপাল না হয়ে যায় না । আন্ধারিয়া কোঠার পাশে "ভাণ্ডার ঘর" । সেখানে টাল করা পাথর, কাঁসা, পেতল, তামা আর রূপার বাসন । অন্য ঘরগুলিতে নানা প্রকার রসদ এবং রায়তদের ভেটের ফল আর তরিতরকারি । তাদের মধ্যে ডাব-নারকেল আর চূণ-মাখান চালকুমড়োই প্রধান । অন্দরমহলে এক ঠাকুমার দু হাত উঁচু খাটের নিচেও কাঁড়ি কাঁড়ি চূণমাখানো চালকুমড়ো চোখে পড়ত । সেই অন্তহীন কুষ্মাণ্ডসমুদ্র কোন অগস্ত্য শোষণ করতেন, তা আমার জানা নেই ।

বাড়ির সামনের চকের একদিক জুড়ে দু তলা উঁচু দুর্গাদালান । তার মুখোমুখি আটচালা । সেখানে শখের থিয়েটারের জন্য বাঁধান স্টেজ । স্টেজের উপর সারি সারি সীন দাঁড় করান—রাজপ্রাসাদ, যুদ্ধক্ষেত্র, সমুদ্রকূল, নদীতীর, উপবন কিছুরই অভাব নেই । এই থিয়েটার নিয়ে অনেক কাহিনী গ্রামবাসীর আড্ডার উপজীব্য ছিল । জনৈক গণশা নাকি একদা 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে আন্টিগোনাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় । তার কারণ নামগত সাদৃশ্য সন্দেহ নেই । বাদলা লাগান চকচকে পোশাক পরে হেলেনিক বীর সেজে গণশা স্টেজে এসে দাঁড়াল । সফেদা আর রুজ মেখে তার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখখানা অত্যন্ত খোলতাই হয়েছে । তার এই চমকপ্রদ চেহারা দেখে সামনের সারির দর্শকরা মহা উৎসাহে অভ্যর্থনা জানাল—"গণশা আইছে । গণশা আইছে ।" আন্টিগোনাস ফিক করে হেসে স্টেজ ত্যাগ করলেন । "করলি কি ? চইললা আইলি ক্যান ?" ইত্যাদি উদ্বিগ্ন প্রশ্নের তার এক অনমনীয় উত্তর, "চেনছে ।"

নাট্যরসের মূল কথা অবিশ্বাসকে মুলতুবি রাখান, ''willing suspension of disbelief.'' এন্টিগোনাসকে দর্শকমণ্ডলী গণশা বলে সনাক্ত করলে আর কি ভাব থেকে রসে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ?

সেরেস্তার কর্মচারি অক্ষয়বাবুর মুখখানা ছিল সদাবিমর্ষ। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ওঁর কথা ভেবেই জীবন ও জগতকে "সর্বং দুঃখং, সর্বং দুঃখং' বলে বর্ণনা করা হয়। এই নিতান্ত গোবেচারা মানুষটিও শখের থিয়েটার থেকে নিস্তার পেতেন না। অবশ্যি ভগ্নদূতের ভূমিকায় ওঁর চেয়ে যোগ্য অভিনেতা পাওয়া কঠিন হত। কিন্তু নেহাত অবিচার করে 'প্রফুল্ল' নাটকে ওঁকে জেল-দারোগা সাজান হল। কয়েদি সুরেশের ভূমিকায় লেখকের সেজ জ্যাঠামশায়। গ্রামে বাঘ বিশেষ আসত না। কিন্তু কখনও এলে যে সেজবাবুর ভয়ে বড়হিস্যার পুকুরঘাটে গোরুর সঙ্গে একত্র জলপান করবে, সে বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত ছিল। অক্ষয়বাবুর পার্ট এক লাইন। ক্রন্দনরত সুরেশকে লাথি মেরে বলতে হবে, "শালা কাঁদছিস কেন, পাথর ভাঙ।" রিহার্সালের সময় এমন বাক্য তাঁর মুখে এল না। শুধুই বলতেন, "স্টেজে কমু হ্যানে।" স্টেজে বলার সেই দুর্দিন শেষ অবধি এল। সীন উঠল। সুরেশরূপী মহাকায় সেজবাবু পাথর ভাঙছেন। গ্লিসারিনের সাহায্যে তাঁর অনভ্যস্ত চোখে জল আনারও ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দারোগা নীরব। প্রম্পটার উদ্বিগ্ন, "ও অক্ষয়, পার্ট কও, হাক করিয়া খাড়াইয়া আছ কিয়ার লইগগা ?" অনেক ইতস্ততর পর খাকি সার্টপ্যান্টধারী জেল-দারোগা অক্ষয় তাঁর অবিস্মরণীয় পার্ট বললেন, "অ সুরেশবাবু, কান্দেন ক্যান ? পাথর ভাঙ্গেএন।"

স্টেজে একস্ট্রার ভূমিকায় আমরাও নামতাম—বিশেষ করে গাজনের সীন থাকলে। নসা কাকা তাঁর মহতী ভুঁড়ির উপর বাঘছাল বেঁধে ত্রিশূল হাতে মহাদেবরূপে বিরাট বিরাট লাফ মারতেন। শিবতাণ্ডবের সেই বিশিষ্ট পরিবেদনের সঙ্গে তাল রেখে ঐকতান সংগীত আমাদের দায়িত্ব :

"বড় পাকে পড়েছে এবার ভোলা দিগম্বর।
অভিমানী উমারানী করবে না আর স্বামীর ঘর।"

তারপর আমাদেরই মারফত শিবের উক্তি :

বুড়া বেদ্ধ হইছি আমি কখনও বা মরি।
তোমার শঙ্খ পর গিয়া তোমার বাপের বাড়ি।

এবং তৎসহ নৃত্য। কিন্তু শিবরূপী নসাকাকার প্রলয় তাণ্ডবের ফলে এ দায়িত্ব বেশীক্ষণ পালন করা সম্ভব হত না। কারণ ঐ দেববপুর নিচে চাপা পড়লে আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জীব নিঃসন্দেহে শিবলোকপ্রাপ্ত হত।

গ্রামের অনাথজ্যাঠার কবিত্বশক্তি এবং রসবোধ দুই-ই উচ্চকোটির বলে খ্যাতি ছিল। শখের থিয়েটারে তিনি সাধারণত মুনিঋষির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। একবার বিশ্বামিত্ররূপে মাথায় জটাজূট, মুখে কাপাসতূলার দাড়ি লাগিয়ে রামলক্ষ্মণকে তাড়কাবধলীলায় গাইড করছেন। তাড়কারূপী দামুকাকা কালিঝুলিমাখা মুখে সোলার দাঁত পড়ে কোমরে কালীমূর্তির কাছ থেকে ধার করা নরমুণ্ডের মালা বেঁধে হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসছেন। বিশ্বামিত্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে তীরনিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। রামের বাণে তাড়কা অনাহতা থাকল।

শুধু পপলার লরেলাদি বিজাতীয় বৃক্ষশোভিত বিলাতি বনের সীনটি ছিঁড়ে ফর্দাফাই হল। প্রত্যুৎপন্নমতি অনাথজ্যাঠা ব্যাপারটা সামলে দিলেন। অভিশাপের ভঙ্গীতে তর্জনী নেড়ে বললেন,

"অরে রাম গুণধাম কি কাম করিলি ?
তাড়কা বধিতে তুই সীন ফুটাইলি ?"

অনাথজ্যাঠার সবচেয়ে স্মরণীয় ভূমিকা, "স্বর্ণলতা"র বুড়ো খোকা গদাধর। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বপুষ্মান গদাধর স্টেজে ঢুকতেন। তারপর আধো-আধো বুলিতে আত্মপরিচয় প্রদান, "নামটি আমার গডাঢর, সবাই ডাকে গডা।" "কি খাবি" এই প্রশ্নের উত্তরে আহ্লাদে গলে পড়ে, "ডুডুও খাব, টামাকুও খাব।" গদার দিদি বকুনি দিচ্ছেন, "গদা, তোর বুদ্ধি দিন দিন লোপ পাচ্ছে ?" শুনে গদার হাততালি সহকারে নৃত্য, "ডিডি, টবে আমার বুডটি শিলো !"

গ্রামের সব আমোদ-আহ্লাদে থিয়েটারের মত আয়োজন বা খরচ-খরচার দরকার হত না। দামুকাকা ছিলেন স্বভাব-অভিনেতা, অবশ্যি তার repertoire-এ একটিই আইটেম ছিল। গালের ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বের করে দশাসই ভুঁড়ি বাজিয়ে তিনি একটা ছড়া আবৃত্তি করতেন। গ্রামবাসীদেরও এই বহুদৃষ্ট এবং বহুশ্রুত অভিনয়-তথা-আবৃত্তি সম্পর্কে উৎসাহ অপরিসীম ছিল। সকাল-সন্ধ্যা যে কোনও সময় পথে-ঘাটে গুণমুগ্ধ শ্রোতারা তাঁকে ধরতেন, "অ দামু, হুনাও (= শোনাও)।" ভুঁড়ি বাজিয়ে দামু যা হুনাতেন, তা কতকটা এইরকম শুনতে,

"হোতমা হোতমাই অ বেনেবউ !
হোতমা হোতমাই গো যাচ্ছ ?
হোতমা হোতমাই যাই বাড়ি।
হোতমা হোতমাই কি হইলো ?
হোতমা হোতমাই হইল পোলা।
হোতমা হোতমাই খায় কি ?
হোতমা হোতমাই ডালিচালি।"

তারপর একই আঙ্গিকে নবজাতকের ডালচাল খাওয়ার পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী শারীরিক প্রক্রিয়াগুলির ধ্বনিময় বিবরণ থাকত।

আর ছিল নাচুনী বুড়ি। তার শিল্পীচিত্ত এবং আত্মগৌরববোধ বিনা আহ্বানেই রসপরিবেশন করত। পুকুর পাড়ে বাজারের রাস্তায় শ্রোতা বা দর্শক পেলেই সে বলত : "আগরতলার মহারাজা আমারে বিয়া করতে চাইছিলে। আমি তমো [তবু] বিয়া বই নাই।" বলেই কোমর দুলিয়ে লাস্য নৃত্য। আগরতলার মহারাজা কি হারাইলেন, তাহা তিনি জানেন না। বুড়ি মহারাজার বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল বটে, কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে সে আমার ছোটকাকার বিবাহিত পত্নী। রাস্তাঘাটে ওঁকে দেখলেই গঞ্জনা দিত, "বিয়া করছ, খাইতে দিতে পার না।" মা-জ্যেঠিমারা বুড়িরই পক্ষ নিতেন। বলতেন, "শম্ভু, ঠিকই ত কয়। বিয়া করছ, খাইতে দিতে পার না ?"

পূজার সময় লাঠিয়ালরা খেলা দেখাত। এখন বুঝি সে খেলা কতকটা

যুদ্ধনৃত্যের ধাঁচে। ঝাঁকড়া চুল ধুলো দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক হাতে পাকা বাঁশের লাল লাঠি, অন্য হাতে বেতের ঢাল নিয়ে দুই দল লাঠিয়াল বাড়ির সামনের মাঠে নামত। তারপর বিকট আওয়াজ করে পরস্পরকে আক্রমণ। শন শন লাঠি ঘুরত, মাঝে মাঝে বোল শোনা যেত, "শির, তামেচা, বাহিরা, কোটি", আর লাঠির ঘায়ে ধপাধপ লাশ পড়ত। খেলা শেষ হলে মৃত সৈনিকরা পুনর্জীবিত হয়ে বাবুদের পেন্নাম করে বিদায় নিত।

কিন্তু সব খেলা এরকম নিরামিষ ছিল না। মারাত্মক খেলাগুলি জমত রাত্রির অন্ধকারে এবং আমাদের শৈশবের আগেই তারা প্রায় অতীতের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের সজীব স্মৃতিচিহ্ন আমরা দু-একটি দেখেছি। এক গৌরবর্ণ অতি সুপুরুষ বৃদ্ধকে গ্রামের বাড়িতে প্রায়ই দেখতাম। তার পেটে ভয়াবহ একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল। শুনতাম, বহু বছর আগে দুই হিস্যার জমি নিয়ে লড়াইয়ে ছোট হিস্যার দলের এই লাঠিয়ালের পেটে সড়কি বসে যায়। তার সঙ্গীরা রণে ভঙ্গ দিলে আহত লাঠিয়ালকে কেটে পুঁতে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কারণ সে বেঁচে থাকলে ইংরাজের আইনে তার সাক্ষ্য প্রতিপক্ষের হাতে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু শেষ অবধি কেনা গোলাম হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতির বদলে তাকে প্রাণভিক্ষা দেওয়া হয়। এককালের এই দুর্দান্ত মানুষটির মত সদাপ্রসন্ন স্নেহপ্রবণ লোক বেশি দেখিনি। আমাদের পরিবারের সবাইর প্রতি তার কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসার অন্ত ছিল না। তাকে যে আমরা প্রাণে মারিনি, আমাদের এই অবিশ্বাস্য করুণাটা সে যেন এক মুহূর্তও ভুলতে পারত না। যুগ যুগ ধরে কত মারীচ যে ছোটবড় নানা সাইজের রাম-রাবণের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, মানবজাতির বীরত্বের ইতিহাসে তার হিসাব কেউ রাখেনি।

নীরদবাবু তাঁর শৈশবে পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার মনে হইত গ্রাম্যজীবনের প্রধান ধর্ম ছিল একটা অপার শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন স্থৈর্য। এইসব গ্রামে সময়ের নদী যেন স্রোত বন্ধ করিয়া দীঘিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।" নিস্তরঙ্গ শান্তিময় গ্রাম্য জীবন আমাদেরও শৈশব এবং বাল্য অভিজ্ঞতার অঙ্গ। অনেক সময় সাইকেল চড়ে বরিশাল থেকে কীর্তিপাশা চলে যেতাম। ষোল মাইল পথ। হেমন্ত বা শীতের সকালে পার হতে কষ্ট হত না। মফঃস্বল শহরের মোটরগাড়ি-বিরল গতানুগতিক জীবন এমন কিছু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বা যুগযন্ত্রণাক্লিষ্ট ছিল না। তবুও গ্রামে ঢুকলেই মনে হত, যেন বাকি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে এক অন্তহীন শান্তির জগতে প্রবেশ করলাম, যে শান্তি এক মুহূর্তে শরীরমন ছেয়ে ফেলে। তার আশ্রয়ে পরীক্ষার পড়ার তাগিদ, বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণা, দুরাশা, সংসারে অস্বাচ্ছন্দ্যের সূচনা সব কিছুই নিতান্ত অবান্তর হয়ে যেত। এই শান্তি যে গ্রামের দুঃখদারিদ্র্য বিবাদবিসংবাদের উপর শুধু একটা ক্ষীণ আস্তরণ, সেই রূঢ় সত্যের প্রমাণ মাঝে মাঝেই পেতাম। জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দাঙ্গাহাঙ্গামা শুধু দুই জমিদার পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'প্রজাপুঞ্জ'র জীবনেও সম্পত্তি নিয়ে কাজিয়া প্রায় কেন্দ্রীভূত ছিল বললেই চলে।

একটা ঘটনা খুব স্পষ্ট মনে পড়ে। শরতের সুন্দর সকাল। হঠাৎ গ্রামের স্বাভাবিক নীরবতা চূর্ণ করে এক বিকট হট্টগোল শোনা গেল। দেখলাম, একটি

লোক দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। রক্তে তার গা ভেসে যাচ্ছে। মাথায় একটি রামদা বসান, পেছনে এক ছোটখাট জনতা। সবাই তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। লোকটি আমাদের বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ঢুকে আটচালার সামনে শুয়ে পড়ল। তারপর সবাই তাকে ধরাধরি করে দোতলার বৈঠকখানায় পাথরের টেবিলে নিয়ে শোয়ালো। গ্রামের ডাক্তারবাবু সযত্নে মাথা থেকে রামদা উদ্ধার করলেন। শুনলাম, জমি নিয়ে কাজিয়া বাধায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠর মাথায় রামদা বসিয়েছে। রামদাক্রান্ত কনিষ্ঠ আশ্রয় এবং সুবিচারের সন্ধানে জমিদার ভবনে দৌড়ে এসেছে।

পরবর্তী কাহিনী আরও চমকপ্রদ। সরেজমিন তদন্তে প্রকাশ পায় যে রামদা বড় ভাই না, ফরিয়াদি নিজেই নিজের মাথায় বসিয়েছে। উদ্দেশ্য—জমি নিয়ে দেওয়ানি মামলাটা ফৌজদারি মামলায় পরিণত করে জ্যেষ্ঠকে নাজেহাল করা। শুনেছি, এরকম ঘটনা খুব বিরল ছিল না। প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলার জন্য নিজেকে বা নিজের স্ত্রীপুত্রকে জখম করে ফৌজদারি মামলা বাধান জমি নিয়ে লড়াইএর অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। "কোপাইছে", "মাথায় রামদা বসাইছে"—এ জাতীয় বর্ণনা তহশীলদার বা মৃধাদের মুখে প্রায়ই শোনা যেত। মামলাবাজরা রামদা বসানর আঙ্গিকটা খুব উঁচু স্তরে তুলেছিল। ভয়াবহ অস্ত্রটা মাথার খুলিতে দিব্যি বসে থাকত, কিন্তু তাতে প্রাণহানির আশংকা ছিল না।

অবস্থাপন্ন রায়তদের মধ্যে জমি নিয়ে মামলাটা একটা বিলাসের স্তরে পৌঁছেছিল বললে খুব ভুল হবে না। শোনা যেত যে বর্ধিষ্ণু প্রজারা (যাঁরা আজকাল জোতদার নামে অভিহিত মার্কিন ও ইংরাজ ভারত-'বিশেষাজ্ঞরা' বলেন 'জোতেদার') ফসল ভাল হলে তাঁদের সেই সৌভাগ্য নিয়ে কি করবেন ভেবে চিন্তায় পড়তেন : "কয়েন দেহি বড়মেয়া, আর এড্ডা নিকা করি না চাচার লগে আরেগডা মোকদ্দমা বাধাই ?"* চিন্তারই বিষয়। প্রবল পুরুষদের কিসে বেশি সুখ, তা নির্ণয় করা কঠিন।

মামলা তথা রামদাবাজ এক প্রবল পুরুষ আমাদের প্রায় পরিবারভুক্ত ছিলেন। আফছারউদ্দিন্ এবং আজহারউদ্দিন নামে দুই প্রজা পরস্পরের মাথায় রামদা বসান। বিজাতীয় সরকার তাঁদের পুরুষোচিত বিক্রমের জন্য যথাযোগ্য সম্মান না দেখিয়ে দুজনকেই আন্দামান পাঠায়। স্বাধীন হিন্দুস্তান হলে এঁদের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে ফোটো তুলে কাগজে ছাপা হত এবং তাঁরা যথাকালে লোকসভা না হোক বিধানসভার সভ্য অবশ্যই হতেন। অত্যাচারী বিদেশি শাসক তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করলেন বটে, কিন্তু বিধাতাপুরুষ তাঁদের ভোলেননি। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, none but the brave deserves the fair ইত্যাদি আপ্তবাক্যের প্রমাণ অচিরেই পাওয়া গেল। আন্দামানে উদ্দিনভ্রাতৃদ্বয় [পাঠিকা/পাঠক, 'উদ্দিন' পদবি বা পারিবারিক নাম না। কিন্তু শ্বেতদ্বীপে যত্রতত্র 'মিস্টার উদ্দিন' পরিচয়বাহী রেস্তোরাঁ

* পশ্চিমবঙ্গানুবাদ : জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, আদেশ করুন। এই নবলব্ধ সম্পদ দিয়ে কি করি ? আর একবার বিবাহ করি না খুল্লতাতর সঙ্গে আরেকটি মামলা শুরু করি ?

ব্যবসায়ীদের সাক্ষাত মেলে। ফলে কথাটা লোকাচারসিদ্ধ মনে করে ব্যবহার করলাম।] দুই বীর রমণীর সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁরাও পরস্পরের এবং আরও দু-চারটি মনুষ্যের মাথায় অস্ত্রপ্রহার করায় আন্দামানবাসিনী। শাস্ত্রে বলে যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েত। রামদাবিলাসী দুই ভাই শক্তিরূপিণী দুই মরদানীকে বধূরূপে গ্রহণ করলেন এবং দেশে ফিরে একান্নবর্তী হয়ে সুখে বসবাস করতে লাগলেন, ইংরিজিতে যাকে বলে happily ever after. তবে শুধু এক অন্নবর্তী না, এক রামদাবর্তীও বটে। ঘরের বেড়ার গায়ে একটি রামদা ঝোলান থাকত। পুরানো অভ্যেসটা যাতে একেবারে চলে না যায় সেজন্য এঁরা মাঝেমাঝে পরস্পরের দেহে অস্ত্রটি প্রয়োগ করতেন। তবে গায়ে মাথার মত কিছু ব্যাপার না। চারজনেরই মুণ্ডু শেষ অবধি ধড়সংলগ্নই ছিল।

আফছারউদ্দিন ওরফে আফছারিয়া আন্দামানে পৌরুষ সংবরণ করে থাকায় সদাচারের পুরস্কারস্বরূপ জেলের বাইরে বাস করার অনুমতি পায়। আসল কথা, কারাগারের ভারপ্রাপ্ত সাহেব আবিষ্কার করেন যে, লোকটির রান্নার হাত আছে। মেমসাহেব তাকে তালিম দিয়ে পাকা বাবুর্চি করে তোলেন। সেই সুবাদে দেশে ফিরে সে আমাদের পরিবারে পাচক নিযুক্ত হয়। তার হাতের রান্না অমৃতবৎ ছিল। কে বলবে ঐ হাতই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে রামদা ধারণ করতে সদাই প্রস্তুত। "পাডার লোশডো" [পাঁঠার রোসটো অর্থাৎ রোস্ট] "তুর্কীর লোশডো" [তুরস্কদেশীয় মনুষ্য না, টার্কী নামক পাখিরই রোস্ট] "মুলাখাডুনির সূপ" [মালিগাটানি সূপ] "এক লাইস রোটি দিয়া পুঠিন" [এক স্লাইস রুটি দিয়ে তৈরি ব্রেড পুডিং] ইত্যাদি নানা পাশ্চাত্য সুভক্ষ্য সে আমাদের খাওয়াত। শুভার্থীরা আমাদের সঙ্গে এই রামদাবাজের দহরম মহরম বিশেষ সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। দুশ্চিন্তিত স্বরে বলতেন, "একদিন তোমাগো কোপাইবে।" প্রকৃতপক্ষে আফছারিয়া আমাদের কখনও কোপায়নি। মহাপ্রভু বলেছেন, "বহির্জন সঙ্গে কর নামসংকীর্তন। অন্তরঙ্গ সঙ্গে কর রস আলাপন।" বৈষ্ণবের রস আলাপনের মত কোপাকুপিটা উদ্দিনপরিবারে নিতান্তই অন্তরঙ্গ ব্যাপার ছিল, নিকটতম আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই উৎসবটা সীমাবদ্ধ থাকত। বহির্জনসঙ্গে কোপ যা পড়ত তা শুধুই পাঁঠা-মুর্গীর উপর। আতঙ্কের কোনও হেতু ছিল না।

নিজ মৌজা কীর্তিপাশাবর্ণন আপাতত আফছারচরিত-মানস পক্ষান্তরে ছহি আফছার-নামা লিখে মুলতুবি রাখলাম।

AMARBOI.COM

শাসন, শোষণ ও প্রজাপালন

লিখতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছি, বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে রায়ত তথা 'প্রজাবৃন্দ' বালকবৃদ্ধ নির্বিশেষে জমিদার পরিবারের যাবতীয় পুংজাতীয় মনুষ্যকে 'মহারাজ' বা একটু ব্যঞ্জনলোপ ও ব্যতিক্রম করে 'মআরাZ' বলে সম্ভাষণ করত। ব্যাপারটা প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হওয়ার পর কিছুটা রহস্যজনক মনে হত। কারণ রাজামহারাজা জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় প্রধানত রবি বর্মার তৈলচিত্র, সখের যাত্রা থিয়েটার বা দেব-সাহিত্য কুটিরের বইয়ে একটু ওরিয়েন্টাল আর্ট মার্কা তে-রঙা ছবি থেকে। প্রথম দুই টাইপের রাজন্যবর্গ আপাদমস্তক চকচকে জামাকাপড় এবং মেকি হীরে-জহরতের গয়না পরতেন। দেব-সাহিত্য কুটিরের মহারাজগণ খালি গায়ে একটু কোমর বেঁকিয়ে রাজবিলাস মুদ্রায় শান্তিনিকেতনী স্টাইলের বেঁটে সিংহাসনে বসে থাকতেন, হাতে গলায় অবিশ্যি বেশ ভারী ভারী গয়না থাকত।* এ ছাড়া জীবন্ত মহারাজার মধ্যে সন্তোষের মহারাজাকে দু-চারবার আসতে দেখেছি। তিনি স্যুটবুট পরতেন বলে ঠিক রাজা বলে মানতে চাইতাম না। পিতৃবন্ধু বলিহারের কুমার** বেশ উঁচু করে ধুতি পরতেন আর সুসঙ্গের মহারাজা পরতেন কোঁচান ধুতি। উপর্যুক্ত তিন টাইপের মধ্যে কোনও মতেই এঁদের ফেলা যেত না। আমাদের পরিবারে সচরাচর কেউ যাত্রার দলের পোষাক পরতেন না। গোটাকয় পাথরের বেঁটে সিংহাসন বাড়িতে ছিল ঠিকই। কিন্তু তার উপর কাউকে কখনও কোমর বেঁকিয়ে রাজবিলাস মুদ্রায় বসে থাকতে দেখিনি। অপ্রাপ্তবয়স্করা মোড়া, পিঁড়ি অথবা ভূম্যাসনে আসীন থাকতাম।

তবু কি সুবাদে আমরা মআরাZ হলাম তা বুঝতে হলে গণমানসের গভীরে

* আর একটু বয়স হলে সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রায় তাঁর বীণাবাদনরত আলেখ্য দেখে জানতে পারি যে চক্রবর্তী সম্রাটরা শুধু জাঙ্গিয়া পরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁদের গলায় অবশ্যি দ্বিজোচিত উপবীত ঝুলত। এলাহাবাদ প্রশস্তির নীচে লেখা ছিল যে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় দু-চারটি অসীম সাহসী অমাত্য সম্রাটকে অন্ততঃ ধুতিটা পরে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরা ফুটন্ত তৈলে পাকৌড়া বনবার পর এ নিয়ে আর কেউ কথা তোলে নি। প্রশস্তির এই পংক্তি কটি খোয়া গেছে। এই ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে আমল দেবেন না।

** পরে ওঁর পুত্র এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণের আচার-ব্যবহার দেখে মহারাজ কাকে বলে কিছুটা বুঝতে পেরেছি।

প্রবেশ করা প্রয়োজন। বরিশাল জেলার গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষরা বালাম চাল মুসুরির ডাল আর খালে বিলে চ্যাং আদি সহজলভ্য মাছের* দৌলতে ঠিক অনাহারে থাকত না, কিন্তু বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের অবস্থা ফুল্লরার বারমাস্যায় বর্ণিত বিচিত্র বেহালের সঙ্গে অনেকটাই মিলত। বিশেষত ওখানে গ্রামাঞ্চলে পৃথিবীর আর পাঁচটা জায়গার মত তিন ভাগ না ৩·৯৫ ভাগ জল। বর্ষার ক'মাস ভদ্রলোকই বলুন আর চাষীজনই বলুন সকলকেই প্রায় বিষ্ণুর মত সমুদ্রে শয়ান হতে হত। ঘরের দাওয়া পেরিয়ে দরমার বেড়া ভেঙে ছাদ ফুটো করে রন্ধন ও শয়নকক্ষে প্রায় হাঁটু সমান জল ঢুকত। যেসব ভাগ্যবানের খাটচৌকি ছিল, তাদেরও সব সময় খুব সুবিধা হত না। অনন্তনাগের মত খাট জলে ভেসে থাকত আর বাসুকির ছানারাও জলের তোড়ে দিব্যি ঘরে ঢুকে পড়তেন, বিরক্ত বোধ করলে ফোঁস করে কামড়ে দিতেন। শিশুদের প্রায় হাঁটার সঙ্গে সঙ্গেই কাটা কলাগাছ ধরে সাঁতার শিখতে হত। নাহলে দাওয়ার জলে অপমৃত্যু সুনিশ্চিত।

উপর্যুক্ত নৃতত্ত্বমূলক বর্ণনার সঙ্গে আমাদের মআরাZ হওয়ার কার্যকারণ সম্বন্ধ ছিল। দরমা ও মাটির সমুদ্রে যতদূর মনে পড়ে একমাত্র আছাদ পাকা ইঁটের দ্বীপ জমিদার ভবন। সেটা চকমিলান, দোমহালা, শুধু দোতালা না দোতালার উপরও ব্যাখ্যাহীন ভাবে দেড় ঘরের তিন এবং এক ঘরের চারতলা। এক তলায় দুর্গাদালান, আটচালা, দোতলায় লম্বা হলঘর, সেখানে রবি বর্মা জাতীয় কিছু তৈলচিত্র [আমার ছাত্রী তপতী বলছেন ভদ্রলোক খুব ভাল আঁকতেন। তা হবে] এবং দু-চারজন পূর্বপুরুষের 'ফোডক' [গ্রামবাসীরা যাবতীয় ছবিকে 'ফোডক' অর্থাৎ ফোটো বলতেন], ঝাড় লণ্ঠন, রাজস্থান থেকে প্রসন্নবাবুর আনা সাদা পাথরের কিছু টেবিল চেয়ার তথা বেঁটে সিংহাসন, দেয়ালের ধার ঘেঁসে বড় দাদু রোহিণীকুমারের সংগৃহীত ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত ফার্সী বই-এর ঠাসা আলমারী এবং অনেক ছবির নেগেটিভ আর ফোটো তোলার সরঞ্জাম। হলঘরের মুখোমুখি 'উত্তরের কোডা' অর্থাৎ উত্তরদিকের ঘর, সেখানে সোফা কৌচ ঝাড়লণ্ঠনের 'ফুডানি' [অর্থাৎ ফুটানি, বরিশালের ভাষায় বিলাস ব্যসনের সুষ্ঠু বর্ণনা]। শুনেছি সেখানে একসময় লক্ষ্ণৌ বারাণসী থেকে আমদানি বাইনাচের ফুডানিও ছিল, আমরা দেখিনি। স্বদেশী আর গান্ধীজির প্রভাবে বাবা-জ্যেঠারা একটু ভিক্টোরিয় হয়ে গিয়েছিলেন, বেশী আসক্তি পছন্দ করতেন না। পরিবারের দু-একজনের একটু ইদিক-উদিক মতি ছিল, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে না।

ফুডানিটা প্রধানত নীচের তলায় এবং বাইরের ঘরগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্দরমহলে সারি সারি ছোট বড় ঘর, আক্ষরিক অর্থেই বার শরিক সপরিবারে সেখানে বাস করতেন। কোনও কোনও ঘরে গড়ের মাঠের সাইজের দু-হাত উঁচু পালঙ্ক, যার নীচে চূণ মাখান চালকুমড়ো আর শুকনো নারকেলের বাহার। বাকি ঘরগুলির সাজসজ্জা আধুনিক, নেহাতই মধ্যবিত্ত মার্কা, মআরাZ উপাধির সঙ্গে একেবারেই খাপ খেত না। রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় ঘরগুলি আরও নিষ্প্রভ দেখাত। শুধু অন্ধকার লম্বা লম্বা সরু বারান্দাগুলি ভূত-উপদ্রুত বলে প্রসিদ্ধি থাকায় আভিজাত্য মরি মরি করেও বেঁচে ছিল।

আতিশয্য যদি আভিজাত্যের লক্ষণ হয় তবে তার প্রকাশ ছিল লোকবলে, অর্থবলে না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আড়ম্বর বা চাকচিক্যেত নয়ই। জমিদারি সেরেস্তায় কত লোক কাজ করতেন কেউ হিসাব রাখত মনে হয় না। আর নানা শ্রেণীর ভৃত্য, পাচক, দাসী, রক্ষক অগণিত বললে অল্পই অতিরঞ্জন হবে। যতদূর বুঝতাম এদের প্রধান কাজ ছিল যে কোনও অজুহাতে পরস্পর ঝগড়া বাধিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচান এবং গৃহিণীদের সালিশী মেনে কোন্দলটিকে উচ্চাঙ্গের নাটকের পর্যায়ে তোলা। নীরদবাবু বর্ণিত গ্রাম্য জীবনের নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বড়হিস্যার বাড়ীতে এই সব সময় প্রবেশাধিকার পেত না ; বিশেষ করে পূজার সময় তো নয়ই। কিন্তু নাটক বা উত্তেজনার কোনও অপ্রতুল ছিল না।

এক শ্রেণীর সেবকদের আমরা একটু ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তাঁদের নাম মৃধা বা বরিশালী ভাষায় মেরধা। তাঁরা জাত্যংশে মুসলমান, জীবিকা বীরধর্ম অর্থাৎ জমিদারের হয়ে লাঠালাঠি করা, ল্যাজা-সড়কি চালান। বাড়ি এবং ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকত, মেরধারা সড়কি হাতে বারান্দা এবং ছাদে ঘুরে ঘুরে সারারাত পাহারা দিতেন। উল্লেখযোগ্য এই যে কলকাতা, বিহার, নোয়াখালির দাঙ্গার পরেও এই প্রথার কোনও রদবদল হয়নি। সড়কিগুলি বিধর্মী কর্তাদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হতে পারে এমন আশংকা কখনও কেউ করেননি। আলিগড়ের যুবকরা কীর্তিপাশায়ও এসে লীগের ঝাণ্ডা গেড়ে গিয়েছিলেন। ফলে মুসলমান প্রজাবৃন্দ ইস্তক মুধাদের মধ্যে অনেকে ধর্মের অনুশাসন এই বিশ্বাসে প্রথম দাড়ি রাখতে শুরু করেন। তা সত্বেও সশস্ত্র মেরধাদের রক্ষক মানতে আমাদের কারও দ্বিধা হয়নি।

এবার গণচেতনার আলোচনায় ফিরে আসি। প্রায় সারা বছর, বিশেষত পূজার সময় আমাদের এবং আশপাশের গ্রামের লোক শয়ে শয়ে জমিদার বাড়ি দেখতে আসত। ট্যুরিস্টকৃত্য করতে বিদেশে যখন প্রাচীন সম্ভ্রান্তভবন বা stately mansion দেখতে গিয়েছি তখন সেই ভিড়ের কথা অনেকবার স্মরণ করেছি। সহায় সম্বলহীন গ্রামবাসী বাঙ্গালীর দারিদ্র্য কত গভীর, জীবন কতটা উত্তেজনাহীন, মধ্যবিত্ত জমিদার ভবন দেখতে আবালবৃদ্ধবনিতার সেই অন্তহীন উৎসাহ তারই অন্যতর প্রমাণ। এদের বাড়ির ভিতর ঢুকতে কোনও বাধা ছিল না। ছাদে, বারান্দায় এরা যথেচ্ছা ঘুরত, পর্দা ফেলা থাকলে তা তুলে জমিদার পরিবার নামক বিচিত্র প্রাণীদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করত। তাদের নিরাভরণ এবং প্রায় নিরাবরণ জীবনে খাট টেবিল আয়না ভাল শাড়ি গয়না সবই চমকপ্রদ, অমেয় ঐশ্বর্যের প্রতীক। মহারাজ মহারাণী ছাড়া এমন বৈভব আর কাহাতে সম্ভবে ?

বরিশালে কৃষকজীবন নিয়ে একটা কিংবদন্তী তখন খুব চালু ছিল। ক্ষেতে বর্ষা নেমেছে, হাঁটু অবধি জল, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে দুই চাষী ধানের চারার রক্ষণাবেক্ষণ করছে। প্রথমের প্রশ্ন, 'ক দেহি, মহারাণি ভিক্টোরিয়া এহন কি করতে আছে ? [বল দেখি, মহারাণি ভিক্টোরিয়া এখন কি করছে ?] উত্তর, "হে কি আর আমাগো মত ? পানি নাবতেই পান্থাভাত খাইয়া কাঁথামুড়ি দিয়া উব্বুত।" [সে কি আর আমাদের মত ? বৃষ্টি শুরু হতেই পান্তাভাত খেয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে উপুর হয়ে শয়ন করেছে] বড়হিস্যার বাড়িতে কাঁথা না,

লেপ-তোষকের বাহার, আহার্য পান্তাভাত না, পাডার মাংস, দই-মেসডো। মা ঠারইনদের গা ভরা গয়না ["ওগুলা হোনার ?" "তয় কি ? একি তর আমার মত ?"]—এততেও যদি মআরাZ না হয় তবে আর কিসে হবে ? মনুষ্যের কল্পনা আর কতদূর যেতে পারে ?

এই বৈভব বর্ণনা করতে গ্রামবাসী মাঝে মাঝে নতুন শব্দ চয়ন করতেন, প্রচলিত ভাষায় কুলিয়ে উঠত না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর প্রথম বিবাহ আমাদের পরিবারে। বিয়ের পর দ্বিরাগমনে জামাই শ্বশুরালয়ে এসেছেন। 'উত্তরের কোডায়' তাঁর বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরের দরজায় প্রজাবৃন্দর ভিড়। জামাই দর্শন এবং উচ্চ কণ্ঠে তাঁর রূপগুণের খণ্ড বিচার চলছে। "জামাইর চক্ষু দুইট্ঠা দেখছ ? জ্বলজ্বল করতে আছে।" "গায়ের রংঠা কিন্তু আমাগো মত"। "চুপ কর্, ঐয়া কয় ? জামাইর পেরানে দুষখ হইবে।" ইত্যাদি। হঠাৎ জামাতার দেহ সৌষ্ঠব ছেড়ে তার পোশাক-আশাকের দিকে নজর পড়ল। এক বালকের কাছে তাঁর গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবি অতি আশ্চর্য্য বস্তু বলে মনে হল। "অ বাপ, অ চাচা, অ বড় মেয়া, জামাইর পেরনডা দ্যাখছ ? ইলিশ মাছের মত চক্‌চক্ করতে আছে।" বড় মেয়া স্মিতমুখে কনিষ্ঠর ভুল শুধরে দিলেন, "দূর পাডা, ঐয়ারে কয় পেরন ? পেরন থাহে আমাগো গায়ে। ওনার নাম পেরমোহন।" [দূর পাঁঠা, ওকে কি পিরান বলে ? পিরান তো থাকে আমাদের গায়ে। ওঁর নাম পিরমোহন।"] পেরমোহনই জমিদারি বৈভবের অন্তিম সীমানা ভাবলে ভুল হবে। আরও সব জমকালো ব্যাপার ছিল। বছরের যেদিনটা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় শুরু হত সেদিনের নাম ছিল "পুইন্যা" অর্থাৎ পুণ্যাহ, রবীন্দ্ররচনায় যার সুমিষ্ট বর্ণনা আছে। পুণ্যটা কার এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। সেদিন ভাণ্ডার ঘর থেকে রৌপ্যদণ্ড সমন্বিত রাজছত্র বের হত। পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি উপস্থিত থাকতেন তাঁর মাথার উপর ছত্র ধরা হত। ছত্রের কাপড়টা কিংখাবের, মোটা জরির কাজ করা, তবে যথেষ্ট যত্নের অভাবে একটু মলিন এবং ছেঁড়াখোঁড়া। পূজার সময় প্রতিমা ভাসানর দিন পরিবারের সবাই ঠাকুরের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে বজরায় যেতেন। সেদিনও জ্যেষ্ঠের মাথার উপর রাজছত্র। তার উপর শোভাযাত্রার সামনে রূপার আশা-সোটা হাতে কয়েকজন পেয়াদা। রাজযোগ্য ফুডানির কোথাও কিছু ত্রুটি ছিল না। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন। এই শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে জমিদারদের রীতিমত সচেতন থাকতে হত, বিশেষ করে পুণ্যাহ জাতীয় পর্বর দিনে। সেদিন প্রজারা নিমন্ত্রিত অতিথি, কিন্তু তাদের আপ্যায়নে কূটনৈতিক কায়দাকানুনের মত সূক্ষ্ম protocol বা আদব মেনে চলতে হত। সে আদবের মূল কথা চুলচেরা শ্রেণী বিচার। বর্ধিষ্ণু এবং নেতৃস্থানীয় প্রজাদের মাতব্বর প্রজা বলা হত। তাদের খাওয়া বসার ব্যবস্থা আলাদা। কিন্তু এই আপ্যায়নে ইদিক-উদিক হলে বিশেষ গোলমালের আশংকা। এক পুণ্যাহর দিনে বড়হিস্যার বাড়ীতে প্রায় প্রজা বিদ্রোহের উপক্রম হয়,—মানে গ্রামীণ ইতিহাসে বিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা। সাধারণত নিমন্ত্রিত

প্রজাবৃন্দ হোগলার চাটাইএ বসতেন। সেরেস্তার কোনও ফোঁপরদালাল কর্মচারী ঠিক করলেন যে মাতব্বরদের আপ্যায়ন আর একটু শানদার হওয়া দরকার। ফলে তাঁদের মাদুরে বসতে দেওয়া হয়। তারপর বিকট হাঙ্গামা, ভয়ঙ্কর হৈচৈ। মাতব্বররা আসন ছেড়ে খাওয়া ফেলে দল বেঁধে চলে যাচ্ছেন : "মোরগো ডাইক্কা আনিয়া অপমান করছে।" বাবুরা শশব্যস্তে অকুস্থলে এলেন, "যাইও না, হইলডা কি ? কথাডা কি কও।" আর কথাটা কি ! বরিশাল জেলার লোক সব সহ্য করতে রাজী, কিন্তু অপমান সহ্য করে না। কিসে অপমান হল ? "আর হগলে হোগলায় বইছে আর আমাগো বওনের কি দিছে ? বইলেই হড়হড়াইয়া যায়।" [আর সবাই বসেছে হোগলায়, আর আমাদের বসতে কি দিয়েছে ? বসলেই সড়সড় করে সরে যায়।] মাদুর তুলে হোগলার চাটাই পাতা হল। তখনকার মত প্রজাবিদ্রোহের সমাপ্তি।

এই মান-অপমানের ব্যাপারটা নিয়ে সর্বশ্রেণীর বরিশালবাসীই অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। শুনেছি বড়হিস্যার বাড়ীর এক তহশীলদার অবাধ্য প্রজাদের অভব্যতায় অত্যন্ত বেজার হয়ে হুজুরদের একটি পত্র প্রেরণ করেন। তার বয়ান নিম্নরূপ :

অশেষ সম্মানপুরঃসর প্রতিপালকবরেষু নিবেদন এই যে অধীনকে অত্র তহশীল হইতে ফরান্ বদলী করিবার আদেশ হয়। অধীন বড়ই মনঃকষ্টে বাস করিতেছে। গতকল্য সকাল দশ ঘটিকায় প্রজারা অধীনকে দাড়ি ধরিয়া জুতা মারিয়াছে। অধীন তাহাতেও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু অদ্য তাহারা অধীনকে অপমান করিবে বলিয়া শাসাইয়া গিয়াছে। সব সহ্য হয় কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান অপমান সহ্য করিতে পারিবে না। ইতি সেবক...

বরিশালের গ্রামাঞ্চলে দাড়ি ধরিয়া জুতা মারার ঘটনা একাধিকবার চোখে পড়েছে। জুতা মারা বা খাওয়া জীবযাত্রা বা human condition-এর অঙ্গীভূত বলেই লোকে জানত। তাবলে অপমান সহ্য করতে কেউ রাজী ছিল না। কিসে কখন কার অপমান হবে আগে থেকে নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। পর্তুগীজ-অধ্যুষিত পাদ্রী শিবপুর অঞ্চলে আমাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। ঐ অঞ্চলে বেশ কিছু মানুষ ছিলেন যাঁদের নাম পর্তুগীজ—গোমেজ, আলভারেজ, দিয়াজ ইত্যাদি। এঁদের কারও কারও শরীরে পর্তুগীজ রক্ত ছিল। বাকীরা ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজদের আওতায় যাঁরা রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হন তাঁদের বংশধর। "তোমরা কি জাত ?" এই প্রশ্নের উত্তরে এঁরা বলতেন, "আইগ্গা মোরা রোমাই কাত্তিক।" কিন্তু রোমাই কার্তিকদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমান বা নমশূদ্র চাষীদের চেহারা বা আচার-ব্যবহারে কোনও তফাত ছিল না। কর্তা ব্যক্তিদের একজন কাছারি পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখেন—কার্তিক সম্প্রদায় প্রচণ্ড উৎসাহে কালীপূজা করছেন। তাঁর দুর্ভাগ্যবশত তিনি অসতর্ক প্রশ্ন করলেন, "এয়া কি ? কালী পূজা করতে আছ ? তরা না রোমাই-কাত্তিক ?" দিয়াজ, আলভারেজ কোম্পানী বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন, "রোমাই-কাত্তিক হইছি দেইখ্যা কি আমাগো জাইত গ্যাছে ?" ঠিকই ত, ধর্ম পরিবর্তন করলে জাত যায়, স্মৃতিশাস্ত্রে এমন কথা কোথায় লেখা আছে ?

কালিদাস কবি যাই বলুন, বাক্য এবং তার অর্থ, ভাষা এবং ভাবের পরস্পর

সম্পৃক্ততা সব সময় শ্রোতার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। বরিশালবাসীর প্রচণ্ড পৌরুষ আকাশচুম্বী machismo যে ভাষায় প্রকাশিত হত, বিদেশীর কাছে হয়ত তা প্রয়োজনহীন কঠোরতায় চিহ্নিত। কিন্তু সে ভাষার প্রেরণা উদার মানবপ্রেম, সমস্ত বসুধাকে কুটুম্বজ্ঞান। তার সামাজিক আদর্শ শ্বেতকেতু মুনির প্রতিষ্ঠিত একপতিত্ব প্রথার পূর্বকালীন যুগ—মনুষ্য সভ্যতার সানন্দ ঊষাকাল। সেই আদর্শ সমাজে সবাই সবাইর 'হালা' এবং মনুর সন্তানরা অধিকাংশই 'হারামজাদা'। মনের আবেগ বেশী প্রবল হলে শেষ কথাটি 'শাআরামজাদা' উচ্চারিত হত। জমিদারি কাছারিতে এই শব্দ দুটি সর্বকার্যেই ব্যবহৃত হত—যাগযজ্ঞে ওঙ্কার ও স্বাহা ধ্বনির মত। কিন্তু এ ধরনের আদর আপ্যায়নের মূলগত উদার উদ্দেশ্য বুঝতে কারও কষ্ট হত না। শুনেছি কর্তাদের কেউ সেরেস্তার জনৈক কর্মচারীকে 'হালা' সম্বোধন করায় সম্বোধিত ব্যক্তি অত্যন্ত পুলকিত হয়ে সবাইকে জানায় "কর্তায় কইছেন বউ-এর ভাই।"

আমাদের অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্বভারতে অনেকদূর অবধি এগিয়েছিলেন। কিন্তু যোজন বিস্তৃত এক নদীর পারে এসে তাঁরা থেমে যান। যুধিষ্ঠির দেখলেন, নদীর ওপার শস্যশ্যামল, যতদূর চোখ যায় ধানের ক্ষেত আর বাঁশঝাড়। নদীর মাঝে মাঝে চর, সেও সবুজ, সেখানেও ধানের ক্ষেত। ধর্মপুত্র মধ্যম পাণ্ডবকে বললেন, "বৎস ভীম, তুমি একবার সাঁতরে ওদিকটা দেখে এস। জায়গাটা আর্যজাতির বাসযোগ্য হলে আমরাও নদী পার হব।" বৃকোদর সাঁতরে একটা চরে উঠলেন। তারপর উল্লাসে প্রচণ্ড লাফালাফি। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ভাইদের সাদর আহ্বান করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ইশারায় জানালেন, "ফিরে এসো।" তাঁর গলা অতদূর পৌঁছত না। ভীম ফিরে এলেন। বিস্মিত কণ্ঠে জিগেস করলেন, "কী হল ?" যুধিষ্ঠির অনুজকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। পদ্মা পার হওয়ার আগেই মাঝপথে চরে ওঠামাত্র ভীম স্থান মাহাত্ম্যে আবিষ্ট হন। আত্মবিস্মৃত আহ্লাদে তিনি সহোদরদের আহ্বান জানান, "হালারা চল্লিয়া আয়।" ফলে প্রথম পাণ্ডব আর ভরসা পেলেন না। পূর্ববঙ্গ পাণ্ডববর্জিত দেশ হিসাবে বিখ্যাত হল।

আবারও লিখছি "হালা" বা "হারামজাদা" সম্বোধনের মধ্যে অসূয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। অবিশ্যি এই সাধারণ সত্যটা সবাই সবসময় বুঝতে পারত না। মুখের বারতার পিছনে অন্তরের যে অন্তরঙ্গ কথা তা অস্পষ্ট থেকে যেত। বড়হিস্যার ভৃত্যকুল একবার তাদের এক প্রবীণ সহকর্মীর বিরুদ্ধে হুজুরে নালিশ জানায়। বৃদ্ধর নাকি বয়ঃবৃদ্ধির ফলে বাক্‌সংযম সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে অনুক্ষণ হারামজাদা ডাকছে। লেখকের ঠাকুর্দা বৃদ্ধকে ডাকলেন, "বুড়া, তুমি নাকি হগলরে হারামজাদা কও ?" বৃদ্ধ সাতহাত জিভ কেটে গভীর পরিতাপের সঙ্গে বলল, "কয়েন কি ? এমন কথা কারওরে আমি হাত [সাত] জন্মেও কই নাই। কে নালিশ করছে, হ্যারে বোলায়েন। এই হানেই [এই খানেই] ফয়সলা হইয়া জাউক।" প্রধান ফরিয়াদীকে তলব করা হল। তাকে দেখামাত্র বৃদ্ধ তেড়ে গেল, 'কিরে হারামজাদা ! তরে বলে আমি হারামজাদা কই ?" ঠাকুর্দা বললেন, 'অ বুড়া, এই ত কইলা।" উদার

হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বৃদ্ধ বলল, "হুজুর, ওয়া তো লব্‌জো", অর্থাৎ মুখের কথামাত্র।

এই বৃদ্ধ বয়সের কালে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। শুনেছি বড়হিস্যার বাড়ির প্রাঙ্গণে সব কাজ শেষ হয়ে গেলে অনেক রাত্রে ভৃত্যকুল এবং তাদের গ্রামবাসী স্যাঙাতদের গাঁজার আড্ডা বসত। শ্রেণী এবং পদমর্যাদাসচেতন গেঁজেলরা গুণ ও কর্ম অনুযায়ী শ্রেষ্ঠের সম্মান রক্ষা করতেন। এক বৈঠকে একশ এক কল্কে গাঁজা খেতে পারলে কৃতী পুরুষ ময়ূরধ্বজ উপাধি এবং দুই ইঁটের আসনে বসার অধিকার পেতেন। কিন্তু ময়ূরধ্বজ হওয়াই গঞ্জিকাচর্চার শেষ সোপান না। তন্ত্রশাস্ত্রে বলে তন্ত্রের চরম সাধনা মহাচীনে চীনদ্রুমের ছায়ায় চীনাচার্যের শিক্ষায় চীনাচার সাধন। তেমনি গঞ্জিকা-তন্ত্রের শেষ আচার একটানে কল্কে ফাটান। উপর্যুক্ত বৃদ্ধ সেই অসাধ্য সাধন করে 'বোম্‌ফট্' উপাধি এবং চার ইঁটের আসনে বসার অধিকার লাভ করেন। গাঁজার জগতের এই ভারত-রত্নকে তাঁর কীর্তির স্বীকৃতিস্বরূপ বড় ঠাকুর্দা নাকি একশ এক টাকা ইনাম দিয়েছিলেন। তারপর পাঁড় গেঁজেল বলে চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন।

গাঁজার কথাই যখন উঠল, তখন বঙ্গসংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটা সম্বন্ধে দু-একটা তথ্য নিবেদন করি। গাঁজা খেলে মনুষ্যমগজের যে অংশগুলি উত্তেজিত হয়, আমাদের সব উচ্চ চিন্তা, কল্পনা, আধ্যাত্মিক আকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় ভাল ভাল জিনিস নাকি সেই অংশেই বিধৃত। এইজন্যই সাধু সন্যিসিরা গঞ্জিকা সেবন করেন, নিরাকার পরব্রহ্মকে সাকার ঈশ্বররূপে দেখতে সুবিধে হতে পারে এই ভরসায়। গঞ্জিকাপ্রসাদে সঙ্গীত সাধকদের সামনে রাগ-রাগিণীরা মূর্তিমান-মূর্তিমতী হন। তবে ব্যাপারটায় একটু অসুবিধে আছে। গাঁজাভিত্তিক উচ্চকোটির ধ্যানধারণাগুলি ঠিক সোজা পথে যায় না, মাঝে মাঝে একটু গুলিয়ে যায়।

জনৈক কীর্তিপাশাবাসী গঞ্জিকা বিশারদ পুরাণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। দু-চার ছিলিম সেবনের পর তিনি সীতার বস্ত্রহরণ, কৈকেয়ীর শক্তিশেল, ভীম কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন ইত্যাদি অনেক চমকপ্রদ পৌরাণিক কাহিনী শোনাতেন। প্রথম কাহিনীটায় আমাদের বিশেষ আপত্তি ছিল। কারণ 'মেঘনাদবধ কাব্য' পড়ে তখন আমরা পুরোপুরি রাবণের for-এ। লোকটার অকারণ নিন্দায় বড্ড মেজাজ খারাপ হত। গেঁজেল দাদুকে বলতাম, "দাদা, ও সব বলবেন না। রাবণ অতি ভদ্রলোক ছিলেন। দুর্যোধন-দুঃশাসনের মত হাড়হাভাতে গাঁইয়া ভূত না যে বিনা অনুমতিতে কোনও ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দেবেন। বলতে পারেন, তবে তাঁর শিভালরি অপ্সরাদের বেলা কোথায় গেল? কিন্তু কথা কি জানেন, অপ্সরারা দেখতে শুনতে ভাল হলেও আসলে তো আর ভদ্রমহিলা ছিলেন না।" এসব শুনে দাদু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন। বলতেন, "দ্যাখ্, রাম কিছু হাবা আছিলে না। জানকীরে অতটা হেনস্তা করলে হেয়া শুধা শুধা? আর রাবণ ব্যাডা চৌদ্দ বছর মাইয়াডারে বইয়া বইয়া খাওয়াইলে, হেয়া এমনে এমনে? আর অযোধ্যার মানুষগুলা? হেরা কি পাডা?" তারপর তাঁর অন্যান্য পৌরাণিক আবিষ্কারগুলির সপক্ষেও প্রবল যুক্তির বন্যায় ভেসে

যেতাম। "কৈকেয়ীর শক্তিশেল শুনিয়া খুব ত খ্যাঁকশিয়ালের মত খ্যা খ্যা করিয়া হাসলা। এত বজ্জাতি করিয়া মাগী অন্নি অন্নি পার পাইবে? ধম্মো বলিয়া একটা জিনিস নাই? শক্তিশেল তার গায়ে না লাইগ্‌গা লাগবে গিয়া দেবচরিত্তির লক্ষ্মণের গায়ে? আর ভগীরথের সাইধ্য কি গঙ্গার মত সাংঘাতিক জিনিস চলনদার হইয়া লইয়া আসে? বেলেল্লাগিরি করতে গিয়া ঐরাবতডার কি হাল হইছিল ভুল্লিয়া গেছিস? বেজন্মা ভগীরথ ব্যাডার ত পেরথমে গায়ে হাড়গোড়ই আছেলে না। ঐডার কাম গঙ্গা আনয়ন? ও কাম এক ভীম-ই পারে। বাঁচিয়া থাকলে ঘটোৎকচ ছ্যামরা পারত, বাপের নাম রাখত। বাপজ্যেঠার শরিকী কাজিয়ার মধ্যে পড়িয়া মারা গেলে। দেহিস্, ছোট হিস্যা বড় হিস্যার লাঠালাঠির মইধ্যে তরা Zানি নাক গলাইতে Zাইস না। আর এড্ডা কথা শুন্নিয়া রাখ্। শাস্ত্রে কইছে 'যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মহানি প্রজায়তে'। ব্যাস বাল্মিকী গাঁজা খাইয়া যা ইচ্ছা লিইখ্যা থুইছে, হেয়া বিনা বিচারে মান্নিয়া লইতে হইবে? আমাগো মাথায় ঘিলু নাই?" এরপর আর তর্ক চলত না।

আগেই লিখেছি, বড় হিস্যার ভৃত্যকুলের প্রধান কর্তব্য ছিল সপ্তমসুরে কোন্দল। কিন্তু সেই উচ্চাঙ্গের অভিনয় শুধু পরস্পরের চিত্ত বিনোদনের জন্যে এ কথা মনে করলে ভুল হবে। কে না জানে, মসীর শক্তি অসির তুলনায় অনেক বেশী প্রবল। অনেকের মতে রুসো ভলতেয়ারের অগ্নিময়ী রচনাই ফরাসী পুরোনো জমানার ভিত ধ্বসিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শুধু লিখিত অক্ষরই অগ্নির একমাত্র বাহন না। জ্বালাময়ী মুখের ভাষাও প্রবল প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে পারে। বড় হিস্যার ভৃত্যকুল বাক্য দিয়ে খাণ্ডব দাহনের শক্তি রাখত। এবং সেই দুর্বার আয়ুধ নিয়তই প্রভুর কর্মে নিযুক্ত হত।

গালিগালাজের গোলাবারুদ চালনায় চরম দক্ষতা অর্জন করেছিল সেজ ঠাকুমার খাস ভৃত্য অন্তা বা অনন্ত। একদিন ঠাকুমার আদেশ হল, "কাডালডা পাকছে, লইয়া আয়।' কিয়ৎকাল পরে ভগ্নদূতের ভূমিকায় অন্তার প্রত্যাবর্তন, "কাডাল চোরে লইছে।" ঠাকুমার মুখ কালবৈশাখী ঝড় ওঠার পূর্বমুহূর্তের মেঘের মত বজ্রসত্বরূপ পরিগ্রহ করল। তারপর সংক্ষিপ্ত আদেশ. "গাইলা।"

প্রভুর কর্মে অন্তা উঠানে নেমে গেল। তারপর কোমরে হাত দিয়ে অজ্ঞাত চোরের উদ্দেশ্যে তীব্র নিখাদে গাইলান শুরু হল। প্রথম গালগুলো জাতিবাচক—"ধোপাব্যাডা, চামার ব্যাডা, নাপিত ব্যাডা, চাড়াল ব্যাডা, ম্যাথর ব্যাডা।" ধাপে ধাপে পঞ্চমবর্ণের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে, অন্তা দ্বিতীয় বর্গ শুরু করত। এই বর্গে অপকর্মকারী নিম্নযোনিতে নিক্ষিপ্ত হত। "কুত্তা ব্যাডা, হুয়ার[১] ব্যাডা, ছুচুয়া[২] ব্যাডা, কেচ্ছুয়া[৩] ব্যাডা, খাডাশ[৪] ব্যাডা, ভাম[৫] ব্যাডা, হিয়াল[৬] ব্যাডা।" প্রাণী জগতের অন্ত্যজ শ্রেণীর তালিকা শেষ হলে তৃতীয় বর্গে অপরাধীর পিতৃপরিচয় বা তদভাব বিষয়ে বিশদ আলোচনা, এখানে শুধু তার উদ্বাহসংস্কার বর্জিত পিতার সামাজিক অকিঞ্চিৎকরতা সম্পর্কেই স্পষ্ট উল্লেখ থাকত না, যে জৈবিক প্রক্রিয়াদির ফলে ভূমিভার পাষণ্ড মাতৃগর্ভে উপনীত হয় তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকত। কার ঔরসে নরাধমের জন্ম সঠিক জানা না থাকায় এ প্রসঙ্গেও অন্তা বহু মনুষ্যেতর প্রাণীর উল্লেখ করত। স্বীকার করতে হবে এই বর্গটি একটু অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট। কারণ মনুষ্যের দেহ দুর্বল,

জীবৎকাল সীমিত। অন্তাবর্ণিত চৌরজননীর প্রণয়লীলা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে ব্রহ্মার আয়ুষ্কালও যথেষ্ট হত না। চৌরসম্ভব কাব্যের মাতৃপিতৃলীলা সর্গ শেষ হলে স্তরে স্তরে খলনায়কের পিতামহী, মাতামহী, প্রপিতামহী, বৃদ্ধাপ্রমাতামহী ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন চৌদ্দনারীর উদ্দাম লিবিডোর কল্পনাসমৃদ্ধ কাহিনী। তা থেকে রোম সম্রাজ্ঞী মেসালিনা অনেক আইডিয়া পেতে পারতেন। তার ভাব ও ভাষা ব্যঞ্জনা, অনুপ্রাস যমকাদি বিবিধ অলঙ্কারে রত্নখচিত। শুনলে Marquis de Sade নাক-কান মুলে অন্তার ঘরে নাড়া বাঁধতেন। নিতান্তই বাঙ্গালা পাঠকের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে উদ্ধৃতি দেওয়ার ইচ্ছা সংবরণ করলাম। পাঠিকা/পাঠক, আপনি কি হারাইলেন তাহা আপনি জানেন না।

AMARBOI.COM

জনৈক ব্রহ্মদৈত্য ও তাঁর সহগামী কয়েকটি ভূত

কীর্তিপাশায় বড়হিস্যার বাড়িতে এবং তার চারপাশে বহুকাল অবধি কিছু ভূত বাস করত। এ কথা আশৈশব শুনে এসেছি এবং এর সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করার মত দুঃসাহস কখনও হয়নি। সবাই জানতাম— ওঁদের অনর্থক ঘাঁটাতে নেই।

বলাই বাহুল্য— বড়হিস্যাভবনবাসী ভূত সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানের আধার ছিলেন সেই অতিশয় জ্যাঠা জ্যেঠতুত দাদা। এ বিষয়ে তিনিই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে অজ্ঞানতিমিরান্ধ এই অধমের চক্ষুরুন্মীলন করেন। ফলে জানতে পারি— দিনের আলোয় সর্বক্ষণ যাদের স্পষ্ট চোখে দেখতে পেতাম, তাদের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন ভূতের সংখ্যা নেহাত কম না। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা কৃষ্ণবর্ণ লম্বা হাতওয়ালা দ্বিপদরা— বিশেষত যারা অকারণে তাম্বুলরসরঞ্জিত দন্তপাটি এবং কালো মাড়ি বার করে হাত বাড়িয়ে, "অ মনু, আও না, ভয়ডা কিসের" [পশ্চিমবঙ্গানুবাদ : "ও খোকা, এস না, ভয় কি ?"] বলে সম্ভাষণ করত, তাদের আশ্বাসবাণীতে ভুললে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। কথাটা উপর্যুক্ত অগ্রজ আমাকে সম্যক ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। রসাকাকা এবং দামুকাকা ঠিক ভূত না, তবে ভূতেরই সমগোত্রীয় রাক্ষস বা খোক্কস জাতীয় কিছু ছিলেন, —এ তথ্যও একই সূত্রে জানতে পারি। ঐ দুই গ্রামতুত চাচার বৃকোদরতুল্য ভুঁড়ির মধ্যে আমাদের মত অনেক অবাধ্য শিশু যথোচিত কর্মফল ভোগ করছে, বয়স্ক শুভার্থীরাও এ কথা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। বোধ হয় পদমর্যাদা বাড়াবার আশায় কাকাদ্বয়ও এই ভয়ঙ্কর তথ্যের সমর্থনেই রায় দিতেন।

আর যে ফ্যাকাসে চেহারা সাদা থান পড়া স্ত্রীলোকটি আমাদের পাশের ঘরে বাসন মাজত, সেই হাবিদিদির স্বরূপও ভ্রাতৃবর একদিন অতি গোপনে আমার কাছে প্রকাশ করেন। সে রূপ নাকি সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে পর প্রকাশ পেত। এক কাঁড়ি বাসন নিয়ে হাবি পুকুর ঘাটের দিকে রওনা দিত। কিন্তু সকালের আগে আর তার দেখা মিলত না। কারণ আশ-শ্যাওড়ার বনে নৈশ মহোৎসবে হাবিই Queen of the Ball। সেখানে তার আজানুলম্বিত কেশপাশ, পিঠে নয়, মুখের উপর ঝুলছে। পদযুগল সামনে থেকে পিছন দিকে ঘুরে গেছে। চরণ আর ভূমিস্পর্শ করছে না, সে দুটি তখন আশ-শ্যাওড়ার ডালে সংলগ্ন। সাহেবি ভূত ভ্যাম্পায়ার তথা বিবর্তনের ইতিহাসে পথভ্রষ্ট জীব বাদুড়ের মত শাঁকচুন্নীশ্রেষ্ঠা হাবি তখন মাথা নীচে পা উপরে দিয়ে দোদুল দুলছে। দিনের

বেলার স্মিত হাসিটি এখন খিলখিল ধ্বনিতে রূপান্তরিত। আর রাত কি রাণী হাবিকে ঘিরে কঙ্ককাটা গন্ধপিশাচ মামদো হামদো গোভূত মেছো পেত্নী ছাগলারাক্ষসী ইত্যাদি নৈশজগতের যাবতীয় আমীর ওমরাহ্ বিবি বেগম তথা petite noblesse ধেই ধেই নৃত্যে মেহফিল জমাচ্ছে। দিনের আলোয় হাবির মধুর হাসিতে ভুলে যে সব হতভাগ্য শিশু তার হাতছানিতে পুকুর পারে গিয়েছিল, তারা এখন চ্যালাকাঠের আগুনে কাবাব বনছে। তারপরেও অনেক কথা ছিল, কিন্তু তা শোনবার আগেই দু'কানে আঙুল দিয়ে কোনও মতে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করি। পরদিন সকালে উঠে প্রথমেই হাবির সাক্ষাৎ। "পলাও কিয়া" ["পালাও কেন"] বলে পশ্চাদ্ধাবমানা হাবির হাত থেকে রক্ষা পেতে যে দৌড় লাগাই তাতেই প্রথম চার মিনিটের কমে এক মাইল দৌড়ের রেকর্ড স্থাপিত হয়, স্যার রোজার ব্যানিস্টারের অক্ষয়কীর্তি স্থাপনের অনেক আগে। তবে বাঙালীর কীর্তি দুনিয়ার লোক হিংসে করে মানতে চায় না, এ কথা সর্ববাঙালীবিদিত।

দিবালোকে দৃশ্যমান অতিপ্রাকৃত জীবকুল সবাই দ্বিপদ ছিল না। ছোটকাকুর পেয়ারের খাসি রবিনসন* 'হিন্দুস্থানী উপকথা' বর্ণিত ছাগলারাক্ষসীর বৃহন্নলা সংস্করণ, এ তথ্য আমরা সবাই জানতাম। প্রমাণ— তার আওয়াজ, যা নিতান্তই অখাসিজনসুলভ এবং সেই কারণে রোমহর্ষক। কীর্তিপাশার চতুষ্পদ গোষ্ঠীতে রবিনসনই অশরীরী লোকের একমাত্র দেহধারী প্রতিনিধি,— এ কথা ভাবলে ভুল হবে। সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে এবং মা-দুগগো কালী জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি seasonal দেবীদের সেবায় যে সব পাঁঠা-মোষ বলি হত, তাদের সকলেরই আত্মা সুরলোক প্রাপ্ত অথবা পরব্রহ্মে লীন হত, এমন নয়। তাদের মধ্যেও পাপীতাপী নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদী ইত্যাদি ছিল, বলি হওয়াটাকে মোক্ষলাভের পথ বলে মানতে চাইত না। সেই সব হতভাগ্যরা কিছুকাল বায়ুভূত নিরাশ্রয় থেকে শেষটায় দেহী পাঁঠামোষের ঘাড়ে চাপত। তাছাড়া যাদের মুণ্ডহীন করার সময় দর্শকবৃন্দ "বাZছে, বাZছে" [অর্থাৎ "বেধে গেছে, বেধে গেছে", অর্থাৎ এক কোপে নামেনি] বলে ধ্বনি তুলত, গৃহস্থের অনিষ্ট সাধনের জন্য তারাও এই শ্রেণীভুক্ত হত। সাদা চোখে সাধারণ এবং অনন্যসাধারণ চতুষ্পদদের মধ্যে তফাত করতে একমাত্র জ্যেঠতুত জ্যেষ্ঠভ্রাতার মত গুণীজনরাই পারতেন। আমলোক শিংয়ের গুঁতো খেলে তখনই টের পেত। তবে বুদ্ধিমান বালকরা এ সব ব্যাপারে কোনও অকারণ ঝুঁকি নিত না।

কিন্তু ভব্যিযুক্ত বনেদী ভূতদের যখন তখন দিনের আলোয় দেহধারী রূপে দেখা যেত না। তাঁদের আনাগোনা অন্ধকারের আড়ালে অথবা ঠিক দুপুর বেলা 'ঠাটা পড়া' রোদে** নির্জন প্রান্তরে। তাঁদের চেহারা কখনও অস্পষ্ট

* পাঠিকা-পাঠকগণ জানেন, আমরা ক্রোধান্ধ হলে হিন্দী এবং কুকুরের নাম রাখার সময় ইংরেজি ভাষার শরণ নেই। সেই আদর্শেরই গণ্ডী আর একটু বিস্তৃত করে খুড়া মহাশয় খাসির নামকরণে দ্বীপবাসী সেই প্রখ্যাত নাবিকের নাম অবলম্বন করেন।

** ঠাটা অর্থাৎ বাজ। রোদ প্রবল হলে বাজ পড়ে, অজ্ঞাত কারণে অনেক বরিশালবাসীর এই বিশ্বাস।

কখনও ভয়ানক। আবির্ভাব আকস্মিক, ক্ষণস্থায়ী অথবা বিশ্বাসী জনের স্বপ্নে। এই অধ্যায়ের শিরোনামে যাঁর কথা স্মরণ করেছি, বলা বাহুল্য, তিনি এই শ্রেণীর উচ্চস্তরের প্রেত। শাঁকচুন্নী বা ভুতুড়ে পাঁঠা-ছাগলের সঙ্গে একত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করাই বেয়াদবি হয়েছে। সেই অপরাধ বাবদ নিজের নাক কান মলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ, আগেই বলেছি এবং সবাই জানেন— এঁদের বেশী ঘাঁটান ঠিক না। অনুগ্রহপরবশ হয়ে ঘাড় যদি নাও ভাঙেন, ঘাড়ে চাপলেও হেনস্তা কম হবে না। তেমন তেমন পেত্নী* হলে ত' কথাই নেই, জান কয়লা করে ছাড়বে।

এবার যথাবিহিত তাঁর ও তাঁর অনুগামী ডাকিনী-যোগিনীদের পদবন্দনা করে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদৈত্যের পাঁচালী শুরু করি। পাঠিকা-পাঠকরা জানেন, ভাল ভাল হিন্দী ছবির পটভূমি হিন্দুস্তানের চৌহদ্দির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে না। মস্কো, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, লন্ডন, টোকিও, পিকিংয়ের রাস্তায় নায়ক-নায়িকা পলায়মান চোরের স্পীডে দৌড়ে, ভালুকের স্টাইলে নেচে, বিশ্বজনের বিস্ময় উৎপাদন করে প্রণয়লীলার অচিন্তনীয় শৈলী প্রচার করেন। নায়ক প্রবীণ বয়স্ক হলে মঙ্গেশকর ভগিনীদের গানের তালে তালে তাঁর ভুঁড়ির আন্দোলন সাহেব-মেমদের থমকে থামিয়ে মামা-পাপা বলিয়ে ছাড়ে। বিষ্ণুলোকে রাধার বোল বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দী সিনেমার এই বিশ্ববোধের সূচনা অবশ্যই বাঙালী ঐতিহ্যে [গোখলের বাণী স্মরণ করুন]। কীর্তিপাশার ভূতলোকে সেই চেতনা কত প্রবল ছিল ব্রহ্মদৈত্যের কাহিনীতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

ব্রহ্মদৈত্য-নাটকের কুশীলব চার। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় চরিত্র লেখকের দুই কাকা। তাঁরা তখন বিলাতবাসী। একজন ব্যারিস্টার, অন্যজন রয়াল কলেজ অফ আর্টের এসোসিয়েট হওয়ার সাধনায় নিবিষ্ট। এঁদের দুজনেরই কিছুটা কল্পনা-প্রবণ বলে খ্যাতি ছিল। সাধারণ বাঙালীরা চাল দিতে অভ্যস্ত। এঁরা যা দিতেন তা' পরিবারের সবাই পোলাও বলে বর্ণনা করত। এই দুই পার্শ্বচরিত্র ছাড়া নাটকে একটি চতুর্থ কুশীলব ছিল। সে জঙ্গম না, স্থাবর— বড়হিস্যার বাড়ির সামনের মাঠে এক প্রাচীন তিন্তিরিবৃক্ষ।

পাঠিকা-পাঠক, এইবার শ্বাসরোধকারী উত্তেজনায় চেয়ারের কিনারায় এগিয়ে আসুন। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না এমন এক কাহিনী শুনতে প্রস্তুত হোন।

হঠাৎ লন্ডন শহর থেকে কীর্তিপাশা গ্রামে এক তারবার্তা এল— "Stop felling tamarind tree. Letter follows". "তেঁতুল গাছ পাতন বন্ধ রাখ। চিঠি যাচ্ছে।" স্বাক্ষরকারী উপর্যুক্ত দুই শিক্ষানবীশ। বড়হিস্যার বাড়িতে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। সেই প্রাচীন বনস্পতির গায়ে একটু আগেই প্রথম কুঠারাঘাত হয়েছে। বৃক্ষপাতনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে দু'দিন আগে। তিনু-নিনু বা কনিষ্ঠদের তিন্দাদা নিন্দাদা কোন্ অপ্রাকৃত উপায়ে এই সব তথ্য জানতে পারলেন? বিলেত গিয়ে কি এই দুই তরুণ গুরুকৃপা লাভ করে

* নারীআন্দোলনকারিনীরা অপরাধ নেবেন না। পেত্নী ভূতের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক, এই রকম আগ্রাসী পুরুষ-শুয়োরসুলভ রসিকতা করা আমার উদ্দেশ্য না। পুংজাতির ঘাড়ের লক্ষে পেত্নীই অধিকতর ভয়ের কারণ এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে ভূত এই লিঙ্গজ্ঞান-উত্তীর্ণ সাম্যভাবাপন্ন তত্ত্বই আমার বক্তব্যের মূলীভূত।

যোগসিদ্ধ হয়েছেন ? কীর্তিপাশা গ্রাম উত্তেজনায় বিনিদ্র হল। হাটে-বাজারে পুকুরের ঘাটে খালের পাড়ে ইস্কুলে চণ্ডীমণ্ডপে আর কোনও আলোচনা নেই, রুদ্ধ নিশ্বাসে সবাই বিলাতের চিঠির জন্য অপেক্ষমান।

ভূমধ্যসাগর, সুয়েজের খাল, আরব সমুদ্র পার হয়ে তিন সপ্তাহ পর সেই চিঠি কীর্তিপাশার "পোশডো আপিস" এবং সেখান থেকে বড়হিস্যার বাড়িতে পৌঁছাল। "আইয়া গ্যাছে, আইয়া গ্যাছে" ধ্বনিতে গ্রামের আকাশ বাতাস মুখরিত হল। দুর্গাদালানে উৎকণ্ঠিত গ্রামবাসীর ভিড় জমল। জ্যেষ্ঠ জ্যেঠামহাশয় ধীরে সুস্থে চিঠি খুলে তার বক্তব্য সবাইকে পড়ে শোনালেন।

সে এক চমকপ্রদ অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাহিনী।

অনেক রাত পর্যন্ত তাস খেলে তিন্দাদা নিন্দাদা গাওয়ার স্ট্রীটে নিজ নিজ ভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর একই রাত্রে একই সময়ে দুজনে একই স্বপ্ন দেখেন। বৌদিদিরা বললেন, একই দ্রব্য সেবন করার ফলে। স্বপ্নাদেশকারী উভয়েরই বাল্যবন্ধু ছন্তু পাল। ছন্তু বললেন— তিনি গত সপ্তাহে গতাসু হয়ে কর্মচক্রের বিবর্তনে ব্রহ্মদৈত্যত্ব লাভ করেছেন। ছন্তু পাল ইহলোকে সম্ভবত ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কিন্তু পরলোকে তিনি যে ব্রহ্মদৈত্য হন এ বিষয়ে সবাই একমত। বোধ হয়, বিশ্বামিত্রের পর একমাত্র ছন্তুই তপস্যা বলে অব্রাহ্মণত্ব কাটিয়ে ইহকালে না হলেও পরকালে দ্বিজত্ব লাভ করেন। তপস্যার অন্যতর অনুষঙ্গ গাঁজায় তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। সে সব কথা থাক। কাহিনীর মূল problematic -এ আসা যাক।

ব্রহ্মদৈত্যরা উচ্চবৃক্ষের শাখায় বাস করতে ভাল বাসেন। বেশ খোলামেলা লাগে, জাত্যভিমানও বজায় থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্মের দেশ জম্বুদ্বীপে নিম্নবর্গের ভূতেরা অতদূর উঠতে পারে না, আশ-শেওড়া জাতীয় ছোটজাতের ঝোপেঝাড়ে কায়ক্লেশে ঝুলে থাকে। যে তেঁতুল গাছের নীচে পাঠশালা পালিয়ে অনেক দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্ণ ব্যয় করে ছন্তু নিরক্ষরতা অর্জন করেন, তারই উচ্চতম ডালে সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদৈত্য অবতারে তিনি আস্তানা গেড়েছেন। বাবুরা অজ্ঞানতা-পরবশে ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত সেই গাছ কাটতে উদ্যত। ফলে ব্রহ্মদৈত্য উদ্বাস্তু এবং অজ্ঞানকৃত পাপে বাবুদের পরকাল বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা হয়েছে। কথাটা ছন্তু কীর্তিপাশাস্থ বাবুদের অবশ্যই সোজাসুজি জানাতে পারত। কিন্তু দেহান্তে উচ্চশ্রেণীর ভূত হিসাবে তাঁর মর্যাদাবৃদ্ধি হলেও জীবদ্দশায় তাঁর খ্যাতি ছিল প্রধানত গাঁজাখোর হিসাবে। সুতরাং স্বগ্রামে তার স্বপ্নাদেশ চট করে কেউ বিশ্বাস করত না। কিন্তু বিলাতপ্রবাসীদের পাওয়া স্বপ্নাদেশ ? সে আলাদা ব্যাপার। ছন্তুর এই অব্যর্থ চালে আশাতীত ফল হল। তেঁতুল গাছটা বেঁচে গেল। গ্রামবাসীরা ব্রহ্মদৈত্যর নামে বাতাসা থেকে মোষ অবধি নানা কিছু মানত রাখল। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তিন সন্ধ্যা ধরে ব্রহ্মদৈত্য-সংবর্ধনা হল। (পরে কীর্তিপাশা পাকিস্তানে পড়ায় ব্রহ্মদৈত্য জয়ন্তীটা ঠিক চালু হতে পারল না)। যে ছন্তুকে জীবদ্দশায় সবাই হেলাছেদ্দা করেছে, সে দেহমুক্ত হয়ে সুদূর শ্বেতদ্বীপে প্রবাসী দুই বঙ্গসন্তানকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছে, এমন কীর্তি ন ভূত ন ভবিষ্যতি। "সত্য ত্রেতা দ্বাপরমে য়্যায়সা কাম কোই নেহি কিয়া।" এই গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করে কীর্তিপাশাবাসীদের

বুক দীর্ঘকাল দশ হাত ফুলে ছিল। বিলাতফেরত ব্রহ্মদৈত্যর আবাসস্থল হিসাবে সেই প্রাচীন তিন্তিড়িবৃক্ষর খ্যাতি সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। আর কীর্তিপাশা গ্রাম ? ধন্য দেশ এ গাছ যে দেশে। রাজপুত্র সুন্দর এই কাহিনী শুনলে আর চৌদিকে না চেয়ে সোজা কীর্তিপাশা চলে আসতেন, বিদ্যাকে নিয়ে কেলেঙ্কারীটা ঘটত না।

ব্রহ্মদৈত্যকাহিনী যাকে বলে অদ্ভুত রসের দ্যোতক। কিন্তু বড়হিস্যার বাড়ির পটভূমিতে ভয়ানক বা করুণ রসের অবতারণায় তথা রোমহর্ষক অজানা রহস্যের ইঙ্গিত নিয়েও অশরীরীরা মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হতেন। সে সব কাহিনীর দু-চারটি নিবেদন করছি।

লেখকের ঠাকুর্দার বড় তিন ভাই ছিলেন। তাঁদের একজন স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের ঠাকুমা ইংরেজিতে যাকে 'সাইকিক' বলে কতকটা তাই ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি,— জমিদারবাবুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হবার পর তাঁর জীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। বৈশাখের দুপুরে তাঁদের গ্রামের বাড়িতে একদিন তিনি একা বসে আছেন। তাঁর মা পাড়া বেড়াতে গেছেন। বাড়ির সামনে ধূধূ মাঠ, রোদে পুড়ে যাচ্ছে। ঠাকুমা হঠাৎ দেখলেন,— সেই মাঠ পার হয়ে সম্ভ্রান্ত চেহারার এক মহিলা, পরনে চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি, কপালে জ্বলজ্বলে সিন্দুরের টিপ, হন্ হন করে তাঁদের বাড়ির দিকে আসছেন। অচেনা মানুষটি ঘরের দাওয়া পার হয়ে ভিতরে এলে ঠাকুমা তাঁকে প্রণাম করলেন। মহিলা আঁচল থেকে একটি সোনার কৌটা বার করে তাঁর সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন। বললেন, "সুখে থেকো, স্বামীর যত্ন কোরো।" তারপর কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ না দিয়ে আবার মাঠ পার হয়ে কোথায় অদৃশ্য হলেন। আমার এই ঠাকুমা বিয়ের পর ঠাকুর্দার ঘরের দেয়ালে সেই অজানা শুভাকাঙ্ক্ষণীর ছবি দেখতে পান। মানুষটি তাঁর মৃতা সপত্নী, ঠাকুর্দার প্রথমা স্ত্রী।

অনেক বছর পরে ঠাকুমার জীবনে আর একবার অতিপ্রাকৃতের আবির্ভাব হয়। তাঁর স্বামী তখন খুব অসুস্থ। স্বামীর রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে মহিলা পূজায় বসেছেন। চোখ বুজে ইষ্টনাম জপছেন। হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার আওয়াজে তিনি চোখ খুললেন। দেখলেন পূজার থালায় বীভৎস এক নরমুণ্ড। ভয়ে তিনি চোখ বুজলেন। কয়েক মুহূর্ত পর আবার তাকিয়ে দেখেন ও বস্তুটি অদৃশ্য হয়েছে। এই ঘটনার অল্প কদিন পর ঠাকুর্দা মারা যান।

এর পরের ঘটনাটির ব্যাখ্যা যাই হোক, সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। এর বস্তুগত প্রমাণ অনেকদিন আমাদের বাড়িতে সযত্নে রাখা ছিল। ঘটনাটি বাবার কাছে শোনা— প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। ভদ্রলোক অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ অথবা অতিরঞ্জনপ্রিয় ছিলেন না। অতীন্দ্রিয়ে তাঁর কোনও বিশ্বাস ছিল, এমন প্রমাণও পাইনি।

তখন আষাঢ়ের মাঝামাঝি। সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে। বড়হিস্যার বাড়ির তেতলার ঘরটিতে লেখকের ঠাকুর্দা এবং বাবা ছোট roll-top ডেস্কটির দুপাশের দুটি চেয়ারে বসে। ছেলে বাবাকে রমেশ দত্তর 'মাধবী-কঙ্কণ' পড়ে

শোনাচ্ছেন। ছাদের দিকের দরজাটি খোলা। ঠাকুর্দা দরজার দিকে পিছন দিয়ে বসেছেন। বাবার মুখ দরজার দিকে। তাঁর পিছনে দেয়াল ঘেঁষে একটি চেয়ারে সেরেস্তার একজন কর্মচারি গরুড়-পক্ষীবৎ প্রায় জোড়হস্ত হয়ে বসে আছেন,— হুজুরের গ্রন্থশ্রবণ শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। ঠাকুর্দার সঙ্গে তাঁর কিছু কাজ আছে। গ্রামের জীবনে কখনও কিছুতে তাড়া নেই। আর সময়টা সবে সন্ধ্যা। তবে ঘরের সামনের ছাদে তখনই ঘন অন্ধকার। বৃষ্টির জোরটা কিছু বেড়েছে। ঘরের ভিতর অল্প অল্প জলের ছিটে আসছে।

হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একটা ঢিল এসে টেবিলের উপর পড়ল। প্রথম প্রতিক্রিয়া বিরক্তি তথা উষ্মা। জমিদার বাবুর ঘরে প্রায় তাঁকে লক্ষ্য করে জনবিরল সন্ধ্যায় কে ঢিল ছুঁড়ল? "হ্যার [তার] ঘাড়ে কয়ডা মাথা?" পরমুহূর্তেই খেয়াল হল যে ব্যাপারটা প্রজাবিদ্রোহ অথবা শরিকি শত্রুতার চেয়েও জটিল। ছাদে ত কেউ নেই। ঢিল ছুঁড়ে পালাবার পথ অবশ্যি আছে। কিন্তু সে পথ হল মোগলাই স্টাইলের বেজায় উঁচু উঁচু এবং অত্যন্ত সরু সিঁড়ি, যে ধরনের সিঁড়িতে পা পিছলে হুমায়ূন বাদশা বেহেস্ত পৌঁছান। সব মোগলদেরই কেন একই ভাবে ভবলীলা সাঙ্গ হয়নি, সেটাই বিস্ময়ের কারণ। সিঁড়ির বেলা শাহেনশারা কেন এত কার্পণ্য করতেন তা কারও জানা নেই। মোট কথা, বর্ষার সন্ধ্যায় জমিদারকে ঢিল ছুঁড়ে পরমুহূর্তেই হুট করে তে-তলা থেকে ঐ সরু সিঁড়ির পথে অদৃশ্য হওয়া অসম্ভব না হলেও দুরূহ।

সেই ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও বন্ধ করার পুরোদস্তুর বন্দোবস্ত হল। মৃধা-পেয়াদা-ভৃত্যের ভিড়ে ছাদ জনাকীর্ণ। লণ্ঠন-মশালের আলোয় অন্ধকার বিদূরিত। কিন্তু রহস্য সমাধান না হয়ে জটিলতর রূপ নিল। লোকজন জড় হওয়ার পর দ্বিতীয় ঢিল খোলা দরজার পথে ঢুকে প্রথমটির পাশে চেপে বসল। বাবা বলতেন— ঢিলটা যেন অনেক উঁচু থেকে কেউ ছুঁড়ল। কিন্তু সে দিকে অন্য কোনও বাড়িও নেই, উঁচু গাছও নেই।

ঠাকুর্দা সে সময় থিওসফির চর্চা করতেন। দ্বিতীয় ঢিলটি পড়ার পর তাঁর মনে হল সম্ভবত ব্যাপারটা ঠিক ইহলোকঘটিত না। তিনি বেশ উঁচু গলায় বলে উঠলেন, "যদি এই ঘটনার কোনও অতিপ্রাকৃত কারণ থাকে, তবে তৃতীয় একটা ঢিল আসুক।" বলামাত্র তৃতীয় ঢিল আবার যেন অনেক উঁচু থেকে দরজার পথে এসে টেবিলে পড়ল। ঠাকুর্দা এবার বললেন, "এই ঘটনার কোনও অতিপ্রাকৃত কারণ থাকলে, সন্দেহাতীত ভাবে ব্যাপারটা প্রমাণ হোক।" প্রমাণটা নাকি সন্দেহাতীত ভাবেই এসেছিল। চতুর্থ একটি ঢিল এসে প্রায় আমার বাবার কপালে লাগে। কিন্তু সেখানে হঠাৎ থেমে ব্যাংবাজির মত এক লাফে অর্ধবৃত্ত পথে তাঁর মাথা ডিঙিয়ে পেছনের চেয়ারে বসা কর্মচারিটির কপালে প্রচণ্ড আঘাত করে। ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান।

সব অতিপ্রাকৃত ঘটনারই একটা ইহলৌকিক কারণ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। অনেক রাতে খবর এল— সেদিন গ্রামের একজন প্রাচীন বাসিন্দা মারা গেছেন। সেরেস্তার ঢিলাহত কর্মচারিটি নাকি প্রয়াত গ্রামবাসীটির জানী দুশমন ছিলেন। লোকে বলে, ভদ্রলোক মৃত ব্যক্তির সর্বনাশের কারণ। কীর্তিপাশাবাসীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, জীবনে

যে শত্রুতার শোধ দেওয়া সম্ভব হয়নি, পরলোকগত আত্মা দশজনের সামনে তারই কিছুটা বকেয়া মিটিয়ে ইহলোকের মায়া কাটালেন।

সেই পারলৌকিক ঢিল ঠাকুর্দার হাত বাক্সে অনেকদিন রাখা ছিল। পোড়ামাটির তৈরি গোলাটে চারটি বস্তু। গ্রামের ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখি শিকার করতে এই ধরনের 'গুলি' ব্যবহার করত। তবে কি ব্যাপারটা কোনও ক্রূরকর্মা গুলতিবাজের খেল ? কিন্তু ইটগুলি ত কোনও সম্ভব পথে আসেনি। আর ঐ ব্যাংবাজী ? সেটা কি দেখার ভুল ? বিচারটা পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়ে এই অধ্যায়ের শেষ দুটি কাহিনীতে আসি। এ দু'টি গ্রামের দুই কল্পনাপ্রবণ কিশোরের কাছে শোনা। কতটা লবণ মেশান দরকার আপনারাই বিচার করবেন।

পূজা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু পূজার ছুটি তখনও ফুরায়নি। আমরা পুকুরের পাড়ে কজন ছেলে ছোকরা বসে আড্ডা দিচ্ছি। আড্ডাধারীদের একজনের বয়স একটু বেশী— উনিশ-কুড়ি হবে। সে গ্রামের ইস্কুলের একজন মাস্টার মশাইর সম্পর্কে শালা। ছুটিতে দিদির বাড়ি বেড়াতে এসেছে। অন্য পাঁচটি গ্রামের ছেলের তুলনায় তার আত্মপ্রত্যয় কিছু বেশী। শোনা যায় সে দেশের নানা জায়গায় অনেক ঘুরেছে। সুতরাং গেঁয়ো বা মফস্বলবাসী আমাদের মত ক্যাবলাকান্তদের উপর একটু মুরুব্বিয়ানা করার তার মৌলিক অধিকার। নানা গালগল্পের মধ্যে ছেলেটি জানাল যে তারাপীঠে সে এক প্রেতসিদ্ধ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায় এবং অবধূতের পদসেবা করে তাঁর কৃপালাভ করে। আমাদের উৎসাহ থাকলে এবং আমরা ভয় না পেলে সে আমাদের পিশাচ দেখাতে পারে। কখন ? ইচ্ছে হলে এখনই। এমন চ্যালেঞ্জ কে ছাড়ে ? বালখিল্যের দল উৎসাহে টগবগ করতে লাগল। মুরুব্বি ছোকরা বলল, পিশাচ সে তখনই দেখাবে, কিন্তু সবাইকে এক সঙ্গে নয়, এক একজন করে। বড়হিস্যার বাড়ির এক তলার কাছারি ঘরগুলি এই সময়টায় খালি পড়ে থাকত। তারই একটা ঘরে পিশাচসিদ্ধ তরুণ প্রথম ভলান্টিয়ারকে নিয়ে ঢুকল। প্রায় পরমুহূর্তেই তারা দু'জনে ঘর থেকে বের হয়ে এল। প্রথমে পিশাচসিদ্ধ, ভলান্টিয়ারের মুখোমুখি হয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে। তার ডান হাত ঊর্ধ্ববাহুদের মত উপরে তোলা, দুই আঙুলে একটা ছোট কোনও জিনিস ধরা। ভলান্টিয়ার সেই দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আরও কয়েক পা পিছনে হেঁটে ওস্তাদ ডান হাতটি নীচে নামালেন, ভলান্টিয়ারের মন্ত্রমুগ্ধ ভাবটাও কেটে গেল। এর পর দলের অনেকেই ওস্তাদের সঙ্গে একে একে ঐ ঘরে ঢুকলেন এবং একই ঘটনার কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হল।

তারপর তথ্য বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বানুসন্ধান। জানা গেল, সকলেরই একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। ঘরে ঢুকেই ওস্তাদ পকেট থেকে একটি জিনিস বের করে ভলান্টিয়ারদের সেইটির দিকে তাকাতে বলে। জিনিষটির রং সাদা। দেখে মনে হয় যেন ছোট একটা চিরুনির ভাঙা টুকরো, হাতীর দাঁত বা হাড়ের তৈরি, ঐ বস্তুটির দিকে তাকান মাত্র ওস্তাদের চেহারা বদলে গেল, অথবা মনে হল তার জায়গায় অন্য কোনও জীব এসে উপস্থিত হয়েছে। সে প্রাণীটিকে সুষ্ঠু

ভাবে বর্ণনা করতে কেউই পারল না। কিন্তু সবাই যে একই জীবকে দেখেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষের সঙ্গে তার কোথাও কোনও মিল আছে ঠিকই, কিন্তু তার রূপ বীভৎস, ভয়ঙ্কর, কিছুটা অস্পষ্ট। মনে হয় যেন অনেকটা জমাটবাঁধা অন্ধকার নির্মম, ক্রূর মনুষ্যমূর্তি গ্রহণের চেষ্টা করছে। চেষ্টাটা সম্পূর্ণ সফল না। ফলে তার অঙ্গহীন বীভৎসতা আরও ভয়াবহ। কিন্তু তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। দৃষ্টিকে সে যেন কঠিন হাতে আঁকড়ে ধরে আছে। সমস্ত অভিজ্ঞতাটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের। ওস্তাদ চোখের সামনে থেকে সাদা জিনিসটি সরাতেই পিশাচমূর্তিও অদৃশ্য।

ইস্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র সন্দেহবাদী দু-একজন বলল,— ওস্তাদ হিপনোটিজম-এর খেলা দেখিয়েছে। ওস্তাদের জবাব,— খোঁজ নিয়ে দেখ, এক মুহূর্তে মানুষকে সম্মোহিত করা যায় কি না। Hypnotic suggestion বিনা সম্মতিতে কাজ করে না, এবং ফল ফলতে অন্তত কিছুটা সময় লাগে।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হত। কিন্তু দলের একজন বলল,— সম্মোহন কি না তার সহজেই পরীক্ষা হতে পারে। ওস্তাদের অনুপস্থিতিতে কি পিশাচকে দেখা যাবে ? ওস্তাদ বলল, হ্যাঁ, তা সম্ভব। এর পর অবশ্যম্ভাবী অনুরোধ, তবে দেখাও। এবার ওস্তাদ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,— "যা সম্ভব, তা সব সময় নিরাপদ না।" অবধূত তাকে যন্ত্র সমর্পণ করার সময় পিশাচকে মন্ত্রবলে বেঁধে দিয়েছেন, পিশাচ তার অনিষ্ট করতে পারে না। যন্ত্র দেখলেই পিশাচকে দেখা যায়। কিন্তু যন্ত্রটি অন্য লোকের হাতে পড়লে তার বিপদের সম্ভাবনা, কারণ সন্ন্যাসীর মন্ত্র ওস্তাদকেই নিরাপদ রেখেছে। অন্য লোক সেই নিরাপত্তার গণ্ডীর মধ্যে পড়বে না। এ কথা শুনে প্রায় সবাই নিরস্ত হল। দু-একজন বলল,—ওস্তাদ ভাঁওতা দিচ্ছে, ব্যাপারটা হিপনোটিজম ছাড়া কিছু নয়। এবার ছোকরা সত্যি চটে গেল। বলল,— "বেশ ত', যার ইচ্ছে যন্ত্রটি একদিনের জন্য নিয়ে দেখ, আমার কথা সত্যি কি না। কিন্তু ফলাফলের জন্য আমি দায়ী নই।" এবার কিন্তু আর কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখাল না।

শুধু সন্তোষ বলে একটি ছেলে চুপ করে রইল। বর্তমানে মার্কিনবাসী এই মানুষটি ব্যবসা জগতে বেশ সুপরিচিত, সুতরাং তার আসল নাম প্রকাশ করছি না। আড্ডা ভাঙলে সন্তোষ ওস্তাদের পিছু নেয়। ওরই মুখে শুনি,— অনেক সাবধান করে ওস্তাদ যন্ত্রটি ওর হাতে দেয়। তারপর ওটি আর সে ফেরত নেয়নি, এবং আর কখনও ওস্তাদের সাক্ষাৎও মেলেনি।

অনেক বছর পর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হঠাৎ সন্তোষের সঙ্গে দেখা। পরনে দামী স্যুট, ডান হাতের অনামিকায় বিরাট হীরে বসান একটা আংটি। শুধু তার মুখের চেহারা বিষণ্ণ, চোখে একটা ভয়ের দৃষ্টি। মনে হল দামী জামা-কাপড়ের ভিতর হেরে যাওয়া বিধ্বস্ত একটা মানুষ। ফিফ্‌থ্ এভিনিউর এক হোটেলের বারে বসে সন্তোষ এক অদ্ভুত কাহিনী শোনাল।

ওস্তাদের দেওয়া সেই যন্ত্র হাতে পাওয়ায় পিশাচের সঙ্গে না কি তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। অনেক বছর ধরে অতিপ্রাকৃত প্রাণীটি তার সঙ্গী। যন্ত্রটাকে নানা ভাবে সে বিদায় করার চেষ্টা করেছে। সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েও দেখেছে। কিন্তু ব্যাখ্যাহীন ভাবে ওটা বারে বারেই ওর কাছে ফিরে এসেছে।

বয়ঃসন্ধির সময় সন্তোষের উচ্চাশা ছিল অপরিসীম, বলত কোটিপতি না হলে নাকি তার খাঁই মিটবে না। যন্ত্রের বশ প্রাণীটি সন্তোষের সঙ্গে মেফিস্টোফেলীয় এক চুক্তি করে। তার ফলে সন্তোষ নাকি সত্যিই কোটিপতি হয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার কাহিনী। তার শরীর-মন রোগজীর্ণ, পারিবারিক জীবন বিভীষিকাময়। এই গল্পর সত্য-মিথ্যা বিচার করার সুযোগ পাইনি। হয়ত লোকটার রোমান্টিক কল্পনার ক্ষমতা কিছু বেশী, অথবা সে Schizophrenic । অলডাস হাকস্‌লি কাহিনীটি শুনলে হয়ত প্রশ্ন করতেন, "তৃতীয় সম্ভাবনাটা বাদ দিচ্ছ কেন ? জগত-কাণ্ড সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিভিত্তিক ধারণাগুলির সঙ্গে মেলে না বলে ?"

এই পরিচ্ছেদের শেষ গল্পটি আমারই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়র 'অভিজ্ঞতা-প্রসূত'। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। রেঙ্গুনসহ সমস্ত ব্রহ্মদেশ জাপানীদের অধিকারে। পাকিস্তান আন্দোলনের ঢেউও পূর্ববঙ্গের গ্রামে এসে পৌঁছেছে। বাংলার মসনদে 'খাজা-প্রজা' মন্ত্রিসভা.। শের্-এ-বাংলা ফজলুল হক সাহেব প্রধানমন্ত্রী। জমিদারী প্রথা লোপ না হোক, অন্তত পঙ্গু করার প্রতিশ্রুতি কৃষক-প্রজা দলের নির্বাচনী ফতোয়ায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা। কর্ণওয়ালিস সাহেবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে আর বেশী দিন চলবে না, সে বিষয়ে সন্দেহের তখন আর কোনও কারণ নেই। রায়তের কাছ থেকে সহজে খাজনা আদায় হয় না। ওদিকে জিনিসের দাম বাড়তে শুরু করেছে, মন্বন্তর আর বেশী দূরে নয়। একটা বিপর্যয়ের ছায়া মধ্যস্বত্বভোগী এবং জমিদারি সম্পত্তির মালিক বাঙালী হিন্দুর জীবনে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। পূর্ববঙ্গের জমিদার পরিবারগুলি নিরুপায় দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট।

কাহিনীর প্রবক্তা তখন কলেজের ছাত্র। সামনে পরীক্ষা। বড়হিস্যার বাড়ির পূর্ববর্ণিত তেতলার ঘরে বসে সে পড়াশুনা করছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিন্তু তখনও আলো ছাড়াই পড়া যায়। হঠাৎ সে চোখ তুলে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। দুজনেরই গায়ে দামী কাশ্মীরী শাল, ভদ্রমহিলার পরনে চওড়া পাড় গরদের শাড়ি, হাতে সেকেলে ধরনের ভারী সোনার গয়না। ছেলেটি আগে এঁদের কখনও দেখেনি। সে ধরে নিল এঁরা কাছাকাছি কোনও গ্রামের জমিদার এবং জমিদারপত্নী। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে দেখিয়ে বললেন, "এঁকে প্রণাম কর।" ছেলেটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দুজনকেই প্রণাম করল। তারপর ওঁরা দুজনেই সামনের ছাদে এসে দাঁড়ালেন। ভাঙাচোরা কার্নিশ, পলেস্তরাখসা দেওয়াল, ছাদের আনাচে কানাচে শ্যাওলা, কোথাও দেওয়াল ফুঁড়ে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। ভদ্রলোক অবক্ষয়ের এই চিহ্নগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "সব যাবে। এরা কিছুই রাখতে পারবে না।" ছেলেটি এই অপমানজনক উক্তিতে কিছুটা বিরক্ত বোধ করল। হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "আমি তোমাদের শুভার্থী, গুরুজন। সামনে তোমাদের ঘোর বিপদ। সবাইকে বোলো, সাবধান হতে। আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার মঙ্গল হবে।" তখন অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু খোলা ছাদে তখনও বহুদূর দৃষ্টি যায়। কিন্তু সাবধান এবং আশীবণীর পর ছেলেটি আর

আগন্তুকদের দেখতে পেল না।

বয়স্করা এই কাহিনী শুনে ছেলেটিকে বললেন— আগন্তুকদের চেহারা বর্ণনা করতে। সব শুনে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে তাঁদের পিতামহ-পিতামহী, প্রসন্ন সেন এবং ষষ্ঠীপ্রিয়া দেবী, তাঁদের সতর্ক করতে এসেছিলেন। প্রসন্নবাবুকে তাঁরা কেউ চোখে দেখেননি। কিন্তু এক সময় গ্রামে তাঁর মাটির তৈরি একটি মূর্তি ছিল। সেই মূর্তির সঙ্গে ছেলেটির বর্ণনা নাকি হুবহু মিলে যায়। পাঁচ বছর পর যখন দেশবিভাগ এবং সম্পত্তিনাশ হল, তখন এই অপ্রাকৃত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ রইল না।

AMARBOI.COM

শহর বইরশাল

বাখরগঞ্জের জেলা শহর বরিশাল সম্পর্কে নগরবাসীদের গর্বের সীমা ছিল না। সে গর্ব যখন ভাষায় প্রকাশ পেত তখন শহরের নাম স্থানীয় উচ্চারণে বইরশাল বলে সাদরে উল্লিখিত হত। তার অসাধারণত্বর এক প্রমাণ সে দুরধিগম্য— "আইখে শাল যাইখে শাল, হ্যার নাম বইরশাল।" গাঙ্গেয় বদ্বীপের প্রায় শেষ সীমায় অবস্থিত এই জেলায় নদী-নালা এত বেশী যে রেল-সংযোগ আর সম্ভব হয় নি। দু-একবার যা চেষ্টা হয়েছিল স্টিমার কোম্পানির মালিক লর্ড ইঞ্চকেপ বিলাতে বসে কলকাঠি নেড়ে তার দফা শেষ করেন।

AMARBOI.COM

১৮৫০-৫১ সালে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বেড়িয়ে বরিশাল শহরেও পদার্পণ করেন। সেখানে কলেক্টরেটের সেরেস্তাদার, খাজাঞ্চি এবং উকিল-মোক্তারাদি "অনেকানেক মহাত্মার" সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শহরটি তাঁর মতে মনোরম ছিল। অধিকাংশ বাড়িতে হোগলার বেড়া এবং টিনের ছাদ। রাস্তা মাটির বা কাদার। বর্ষাকালে প্যাচপেচে ও অগম্য। রাত্রে কেউ পথে বের হত না। কারণ শহরের নৈশলীলা বা night-life-এর অন্যতর নায়ক ছিল বাঘ।

বরিশাল শহরের রাস্তায় বাঘ দেখেছি বললে অতিরঞ্জন হবে। কিন্তু প্রায়ই রাত্রে 'খাডাশ বাইর হইছে, খাডাশ বাইর হইছে' বলে ধ্বনি উঠত এবং ভীত, পলায়মান গন্ধ-খাটাশের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র তার দেহনির্গত কুবাসে আকাশ-বাতাস ভরে যেত। সেই গন্ধ নাকে নেওয়ার চেয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দেওয়া অনেক সহজ। এই প্রাণীর ইংরাজি নাম skunk। মার্কিন মুলুকে এরা প্রায়ই গাড়ি চাপা পড়ে এবং গাড়িতে তাদের দেহসৌরভ দীর্ঘদিন লেগে থাকে। তার একমাত্র প্রতিষেধক টোমাটো কেচাপ। কথাটা বরিশালবাসীরা জানত না। সে যুগে বরিশাল শহরে টোমাটো কেচাপ খুব সুলভও ছিল না।

স্থানীয় সংস্কৃতিতে খাটাশ বা 'খাডাশে'র প্রতীকমূল্য গভীর ও বহুব্যাপী। সহপাঠী এবং মাস্টার মশাইদের মুখে সস্নেহ গাল হিসেবে 'খাডাশডা" আখ্যা অনেকবারই পেতে হয়েছে। আখ্যাটা 'শূয়ার', 'পাঁঠা', 'গরু'র মত সম্পূর্ণ নেতিবাচক কি না জানি না। খাডাশের প্রতি বরিশালবাসীর একটা প্রচ্ছন্ন স্নেহ ছিল বলেই আমার ধারণা। কিন্তু সব খাডাশের প্রতি নয়। তার প্রমাণ

প্রবাদবাক্য,— "খাডাশের গায়ে ত্যাল, মাক্ মাক্ করে।" প্রবাদে নিন্দার্হ মাক-মাককারী জীবটি অবিশ্যি চতুষ্পদ না, হঠাৎ বড়লোক দ্বিপদ। কিন্তু মনে হয়, যে খাডাশের গায়ে বেশী তেল, বরিশালের সাম্যপ্রবণ সংস্কৃতি তাকেও বর্জনীয় মনে করত। খাডাশের সগোত্র ভাম বা বন-বিড়াল। কোনও কারণে 'ভাম' কথাটা গাল হিসেবে ব্যবহার হত না, কিন্তু অপদার্থ বৃদ্ধের বর্ণনায় 'বুড়িয়া ভাম' [অর্থাৎ প্রবীণ বন-বিড়াল] শব্দ জোটটি প্রায়ই প্রয়োগ করা হত। স্থানীয় কংগ্রেস সভাপতিকে জনৈক কর্মী 'বুড়িয়া ভাম' বলায় একবার শহরে বিশেষ আলোড়ন হয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ভাম কি কারণে নিন্দনীয় জানতে পারি নি। তবে শূয়োর, গরু, পাঁঠা ইত্যাদি জীবজন্তু চরিত্রে বা বুদ্ধিতে মানুষের তুলনায় নিকৃষ্ট— এমনও কোনও প্রমাণ নেই। কথাটা ওদের কানে উঠলে ওরা ত' হেসে গড়িয়ে পড়বে। শূয়োরদের মধ্যে কোনও কাল-বাজারু নেই। পাঁঠা বা গরুরা ঘাটে-মাঠে-লোকসভায় অকারণে বক্তৃতা করে লোককে জ্বালায় না। আর সাধারণভাবে চরিত্রের কথা তোলেন ত' মনে রাখতে হবে ওদের মধ্যে পরস্ত্রী বলে কোনও ব্যাপার নেই।

মনুষ্যেতর প্রাণীজগতের সঙ্গে বরিশাল শহরে আমরা কতকটা সহাবস্থান করতাম। এক-এক সময় ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যেত। আমাদের শহরের বাড়িটা ছিল কতকগুলো কালেপ বা আর্চের উপর। মাটির নীচের জল বর্ষায় যাতে মেঝেকে সুসিক্ত করে না তোলে, সে জন্য এই ব্যবস্থা। ফলে বাড়িটা একতলা হলেও অনেকগুলি সিঁড়ি পার হয়ে ঘরে ঢুকতে হত। কালেপে-র নীচে অনেক সরীসৃপ বাস করত। যেতে আসতে করাইত, জাতি অর্থাৎ কেউটে প্রভৃতি নানা বনেদীবংশীয় সাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। আমরা এদের সঙ্গে একটু সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। কিন্তু ওরা অনেক সময় একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইত। একাধিকবার রাত্রে কড়ি-বরগা থেকে থপ করে করাইত সাপ বিছানার উপর পড়েছে। এক রবিবার দুপুরে বসবার ঘরের কাউচে ঘুমাচ্ছি, হঠাৎ চোখ খুলে দেখি জনৈক 'সোনগুইল' অর্থাৎ চণ্ডীমঙ্গল-বর্ণিত স্বর্ণগোধিকা আমার পাশে তার পাঁচ ফুট দেহ বিস্তীর্ণ করে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমি চোখ খুলতেই মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে কিলবিল করে চলে গেল। ওর এই গায়ে-পড়া ভাবটা আমার সঙ্গত মনে হয় নি।

কিন্তু সরীসৃপদেরও কিছু বলার ছিল। গো-সাপদের মাঝে মাঝেই খুন করে তাদের চামড়া দিয়ে চটি বানান হত, যদিও ওরা কখনও আমাদের চামড়া নিয়ে অনর্থক টানাটানি করে নি। তার উপর জমিদার যোগেন সেন-মশায় যাবতীয় অবোলা পশুপক্ষীদের অযথা বিরক্ত, মানে শিকার, করতেন। কুমীরদের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। বাড়ির পাশেই বহমানা কীর্তনখোলা নদীতে মাঝেমাঝেই কুমীর ভেসে উঠত। শীতের সময় জল কমে গেলে এরা নদীর চড়ায় রোদ পোহাত। যোগেনবাবু এদের জীবন্ত বন্দী করার এক টেকনিক আবিষ্কার করেন। তিনি নীরব পদক্ষেপে কুমীরের নিকটবর্তী হতেন, এবং এক লাফে তার পিঠে চড়ে পাকা কুস্তিগীরের মত বেচারাকে চিত করে ফেলতেন। তখন স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভার সদস্যদের মত তার অসহায়ভাবে

হাত-পা নাড়া ছাড়া আর কিছু করার থাকত না। গরুর গাড়িতে সেই জীবন্ত রাক্ষসকে বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়ে দেখান হত। অবশেষে তার চামড়ায় তৈরি চটি ভদ্রলোকের পায়ে উঠত।

সব জন্তুদের সঙ্গেই যে আমাদের শিকারী-শিকারের সম্পর্ক ছিল তা' নয়। মফস্বল শহরে মোটরগাড়ি তখনও বিরল। এবং ময়মনসিংহ বা উত্তর বঙ্গের মত আমাদের অঞ্চলে ধনীভবনে হাতী বাঁধা থাকত না। বাহন-হিসাবে চতুষ্পদের মধ্যে আমরা ঘোড়ার উপরেই বেশী নির্ভরশীল ছিলাম। তবে ঘোড়ার প্রধান ভূমিকা ছিল গাড়ি টানা,— সে সর্বজনভোগ্যা ছ্যাকড়া গাড়িই হোক অথবা ভদ্রলোকের বাড়ির ব্রুহাম-ল্যান্ডোই হোক। আমাদের বাড়িতে দুটো অশ্বটানিত গাড়ি ছিল। আর ছিল জ্যাক এবং বেগম নামে দুই অশ্ব-অশ্বিনী। জ্যাক শুভ্রকায় অস্ট্রেলীয় ওয়েলার। এক সময় তার পিঠে চড়া হত। পরে তাকে জাতিচ্যুত করে ল্যান্ডোতে জোতা হয়। বাড়ির উঠানে মহাকায় জ্যাকের মৃত্যুর দৃশ্যটা খুব মনে পড়ে। কাত হয়ে শুয়ে অসহায় দৃষ্টিতে কাকে যেন খুঁজছিল। এরা ছাড়া কিছুদিন একটি খর্বকায় মণিপুরী টাট্টু ছিল। তার কপালে "অতু বাবুর অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া" লেখা কাগজ এঁটে আমার দাদা টাট্টুপৃষ্ঠে নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতেন। তাঁর তখন ৬/৭ বছর বয়স। পরিণত বয়সে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সুযোগ তিনি পান নি। অনেক দুর্ভাগ্যের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে নানা গুণে গুণী হেরে যাওয়া মানুষটি বছর দুয়েক আগে লোকান্তরিত হয়েছেন।

অশ্ব-টানিত গাড়ি চড়ে এসে সকাল-বিকাল নানা বিচিত্র মানুষ বাড়ির বৈঠকখানায় জড় হতেন। সব চেয়ে চমকপ্রদ লাগত কাশী ডাক্তারবাবুর গাড়ি— আয়না, কাগজের ফুল, মেম সাহেবের ছবি, সোনা-রং করা ফুলদানী, বাহারে আলবোলা ইত্যাদি মনোহর উপকরণে সজ্জিত। গলাবন্ধ কোটের পকেটে সোনার ঘড়ি, বাঁশবনের প্রত্যন্তবাসী সেই প্রখ্যাত নৃত্যপটু ভুঁড়ো শেয়ালের মত পাকা গোঁফ জোড়া— সব নিয়ে সুপক্ক আম্রসদৃশ এই বুড়োকে এক বিস্ময়কর প্রাণী মনে হত। আর ছিল 'কমপাউন্ডার-ডাক্তার'। আদৌ কম্পাউন্ডার এই ব্যক্তি ডাক্তার মনিবের কথাবার্তা কিছু আয়ত্ত করে দিব্যি পশার জমিয়ে বসে। শরীরের নানা অপ্রত্যাশিত অঙ্গে সে স্টেথিসকোপ লাগিয়ে চিন্তিত মুখে মাথা নাড়ত, রোগীরা আতঙ্কে, প্রত্যাশায় আকুল হয়ে উঠত। শেষে এক রোগীর উরুদেশের নানা জায়গায় স্টেথিসকোপ বসিয়ে "হাঁটুতে ব্রেন নাই" এই তর্কাতীত সত্য ঘোষণা করায় তার পতন হল। আর একটি রহস্যময় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সায়েস্তাবাদের নবাব। অজ্ঞাত কারণে তিনি আজীবন নবাব-জাদা নামেই পরিচিত রইলেন। কেন যে 'জাদা' ত্যাগ করে শুধু নবাব হলেন না, এ রহস্য কখনও সমাধান হয় নি। মিলিটারি ধাঁচে ছাঁটা খাকি হাফ-প্যান্ট হাফ সার্ট পরে তিনি আসতেন এবং শুধুমাত্র ইংরিজিতে কথা বলতেন। বাড়ির সামনের লনে ঘুরে বেড়াতেন ভদ্রলোক, কখনও ভিতরে ঢুকতে দেখি নি। ওঁর নাকি থ্যাকার স্পিংক-এর দোকানে বাঁধা অর্ডার দেওয়া ছিল— রোজ পঞ্চাশ টাকার বিলিতি বই ওঁকে ডাকে পাঠান হত। এই

ব্যয়শৌণ্ডিকতার সুফল পরে আমরা ভোগ করেছি।

আমাদের সব চেয়ে বেশী যাওয়া আসা ছিল বাটাজোড়ের দত্ত-পরিবার, অর্থাৎ জননেতা অশ্বিনীকুমারের ভাই কামিনীবাবুর পুত্র-পৌত্রদের সঙ্গে। কামিনীবাবুর পৌত্র, বর্তমানে নিউ ইয়র্ক-প্রবাসী টুকু ওরফে অশোক, আমার সমবয়সী। সে যুগে পরস্পর কার্ড পাঠাবার রীতি ছিল না বটে, কিন্তু টুকুর আগমন-সম্ভাবনা হলে দত্ত বাড়ির ভৃত্য এসে খবর দিত, "টুকু বাবু আইবেন।" আমরা বাড়িতেই আছি এই খবর নিয়ে সে ফিরে গেলে দুই ঘোড়ার গাড়ি চড়ে টুকুবাবু ভিজিট করতে আসতেন। পরনে নীলবর্ণ সেইলার স্যুট, মাথায় জরির টুপি। ভব্যিযুক্ত ভাবে নানা আলাপ-আলোচনার পর টুকুবাবু স্বভবনে প্রত্যাবর্তন করতেন। তখন তাঁর বয়স চার।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার বরিশালের প্রাণপুরুষ স্বরূপ। চরিত্র-গঠন বিষয়ে উপদেশপূর্ণ অনেক নিবন্ধ লিখে সে যুগের বাঙালী তরুণদের তিনি বড়ই কষ্ট দিয়েছেন। তাদের আর নিশ্চিন্ত কোনও সাধ-আহ্লাদের পথ রাখেন নি ভদ্দরলোক। বোধ হয় এই কারণেই প্রতিশোধ হিসাবে ছোকরারা ওঁর নামে নানা গল্প বানিয়েছিল। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ঈশ্বরভক্ত মানুষ ছিলেন, সকাল-সন্ধে তন্ময় হয়ে উপাসনা করতেন। ছোঁড়ারা রটাত, —ঠিক অতটা তন্ময় না। কারণ জনক রাজার মত উনিও নাকি ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হলেও সংসারের দিকে নজর রাখতেন। শোনা যেত উপাসনার সময় মাঝে মাঝেই উনি ব্যস্ত হয়ে চেঁচাতেন, "গুয়াবাগানে [সুপুরির বাগানে] গোরুডারে ছাড়িয়া দিলে কেডারে ?" কীর্তন শুনতে শুনতে ভাবাবেগে ওঁর দশা হত। ছোঁড়ারা ছড়া বানাল, "গোঁসাই আমার চশমা ধর। আমি একটু দশায় পড়ি।"

ওঁর বড় ভাইপো সুকুমারবাবুকে শিশুকাল অবধি নিজের জ্যাঠামশাই বলেই জানতাম। অন্যমনস্ক অধ্যাপক বলতে কি বোঝায় ওঁকে দেখেই প্রথম বুঝি। দিল্লিতে কলেজে পড়াবার সময় অনায়াসে উনি দুই পায়ে বিভিন্ন জোড়া থেকে আহৃত জুতো পরে, কাঁধে চাদরের বদলে মশারি নিয়ে এবং আরও নানা বিচিত্র সাজে বহুবার ক্লাসে উপস্থিত হয়েছেন।

সে যুগে অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন দুপুরবেলাই হত। কিন্তু এক অন্নপ্রাশনের খাওয়ায় উনি সেজেগুজে লাঠি হাতে সন্ধেবেলা উপস্থিত হলেন। অন্য কোনও অতিথি যে নেই তা খেয়াল না করে দিব্যি আহারে বসলেন। প্রথমেই তেতো ডাল মুখে দিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, "টকের ডাইলডা অতি চমৎকার হইছে"। বৈশাখ মাসের গরমে তেতোর ডাল টক ডালে পরিণত হয়েছিল, এই তুচ্ছ ব্যাপারটা ওঁর খেয়াল হয়নি। একবার বন্ধুভবনে মুর্গীর ঝোল খেতে খেতে বললেন, 'বেশ হইছে। আমাগো বাড়িতে ত' এই সব ন'মাস ছ'মাসে হয় না।" জ্যেঠিমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললেন, "কাইল কি খাইছিলা ?" অপরাধী বালকের মত নিষ্প্রভ কণ্ঠে জ্যাঠামশাই বললেন, "অ, মুর্গী খাইছিলাম বুঝি ? মনেও থাকে না।" বিয়ের পর সস্ত্রীক ওঁকে প্রণাম করতে গিয়েছি। দেখি যথারীতি ইজি চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। বিয়ের খবর ওঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বিস্মৃত হয়েছেন। জিগেস করলেন, "ইনি কে ?" বললাম, "আমার স্ত্রী"। "ফাইজলামি করিও না" বলে

উনি আবার বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

কাল যে বহমান, শিশু একসময় বালক, বালক যুবক হয়—এ ব্যাপারটা জ্যাঠামশাই প্রায়শঃ ভুলে যেতেন। বিশেষ করে ওঁর পুত্র কানুর বিবর্তনটা উনি একেবারেই খেয়াল করেন নি। একবার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট করা হয়েছে। উনি ভাবলেন, ওঁর ভাগ্নে টিকিট করে দিয়েছে। জ্যেঠিমাকে বললেন, "এত পয়সা খরচা করলে ক্যান ?" জ্যেঠিমা বললেন, টিকিটটা কানু করেছে। প্রশ্ন, "পয়সা পাইল কই ?" বিরক্ত হয়ে জ্যেঠিমা বললেন, "চাকরী করে, তার মাইনে থেকে।" "কানু চাকরী করে ? কি চাকরী ?" "ব্যাঙ্কে।" এবার জ্যাঠামশায় সত্যিই উদ্বিগ্ন : "পয়সা চুরি করে নাই ত ?" পকেট থেকে সিকি দুয়ানি হারালে বরাবরই তিনি এই দুর্বৃত্ত বালককে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ব্যাঙ্কে চাকরী করছে বলেই তার স্বভাব বদলাবে, এ কথা মনে করার হেতু কি ?

জ্যাঠামশায় অতি স্পষ্টভাষী লোক ছিলেন। একজন খ্যাতনামা লেখক তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইটি ওঁকে উপহার দেন। বইটি বিশালবপু। জ্যাঠামশায় বইটা নেড়েচেড়ে বললেন, "ল্যাখছেন ত' অনেক, প্যাডিং নাই ত ?" ব্যাপারটা উনি ঠিকই ধরেছিলেন। ঐ বইখানা হাতে নিয়েই প্রথমনাথ বিশী গ্রন্থকারকে বলেন, "দামটা একটু বেশী হল না ? সাড়ে বার টাকা সের, দু' সের পঁচিশ টাকা !"

জ্যাঠামশাই বরিশাল-কৃষ্টি সম্পর্কে অনেক কাহিনী শোনাতেন। ওঁদের ছোটবেলায় নাকি স্থানীয় ব্রাহ্মরা "কুসংস্কার-নিবারণী সভা" স্থাপন করেন। জনহিতৈষী ব্রাহ্ম যুবকবৃন্দ প্রভাতফেরিতে বের হতেন, খোল-করতাল সহযোগে কুসংস্কার-নিবারণী কীর্তন করতে করতে,— (রাগ ভৈরবী, ঝাপতাল)

"প্রভাতে উঠিয়া দেখ মাকুন্দ চো-ও-পা-আ।
বদন ভরিয়া বল 'ধোওপাআ, ধোওপাআ।"

সনাতনীরা বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মদের ব্যঙ্গ করে প্রার্থনা সভা বসালেন। প্রার্থনা হত, "হে পরম-কারুণিক পরমেশ্বর, তুমি আমাদের অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু পিতঃ, তোমার এই মঙ্গলময় সৃষ্টিতে অবিচার কেন ? তুমি জোনাকীর পশ্চাতে আলোক দিয়াছ, আমাদের পশ্চাতে ত দাও নাই প্রভু ?"

জ্যাঠামশাই দিল্লীর কলেজে কাজ নিয়ে ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর একজন জিগেস করলেন, "অ অনাথ [জ্যাঠামশায়ের ডাকনাম], ব্যাতন পাও কত ?" জ্যাঠামশাই বললেন, "এইয়া কি ভদ্দরলোকেরে জিগায় [প্রশ্ন করে] ?" প্রশ্নকর্তা স্মিতমুখে বললেন, "বুzছি, বুzছি। হাজার-বারশ' হইলে ত বুক চিতাইয়া কইতা। পঞ্চাশ-ষাইট টাকা বেতন হইলে কি আর ভদ্দরলোকের মইধ্যে হেইয়া [সেই কথা] কওন যায় ?"

দত্ত-বাড়ির বৈঠকখানায় অনেক সময়ই শহরের জনমত রূপ পরিগ্রহ করত। বাড়ির কাছেই মিত্র-মশায় সাব-ডেপুটি পদ থেকে অবসর নিয়ে অকস্মাৎ সাহেব বনে গেলেন। বাড়ির বাইরে নোটিস টানালেন, "মিস্টার মিটার। ইন/আউট।" সেই বাধা পার হয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলে চাকর স্লেট-পেনসিল নিয়ে উপস্থিত হত, —লিখে দিন, ''Purpose of visit''।

হাফ-প্যান্ট, হাফ-সার্ট পরে মিত্র সাহেব নদীর পাড়ে, আরে থুড়ি, বরিশালের স্ট্র্যাণ্ডে বেড়াতে যেতেন। মুখে পাইপ, হাতে ছড়ি। নেটিভদের থেকে দূরে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সদম্ভে হাঁটতেন। স্টিমার কোম্পানির পাতি-সাহেব দেখলে টুপি খুলে অভিবাদন করতেন। পাতিরা বিশেষ পাত্তা দিত না। একদিন দত্ত-ভবনের বৈঠকখানায় মিত্র সাহেবের পাশ্চাত্যায়ন [কোনও কোনও বিশেষজ্ঞর মতে 'পাশ্চাত্য' কথাটা 'পশ্চাত' থেকেই হয়েছে] সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল। বহুদর্শী এক নাগরিক গভীর চিন্তা এবং বিশ্লেষণের 'ফলশ্রুতি' হিসাবে নিম্নলিখিত মত দিলেন : "এই যে দ্যাহো [দেখ] মিত্তির সাইব, হ্যা [সে] একদিন নলছিটি রওনা দেছেলে। [অবশ্য জ্ঞাতব্য বা N.B = নলছিটি বরিশাল শহরের তিন মাইল পশ্চিমে]। ঝড় ওডলো, পৌছাইতে পারলে না। কিন্তু হেই [সেই] যে পশ্চিম মুহে [মুখে] রওনা দেছেলে, হেইর থিয়া [সেই থেকে] খবরের কাগজ লইয়া মাডে [মাঠে] যায়।" য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা প্রায়শ ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে তৃতীয় জগতের মনুষ্যজাতীয় প্রাণীদের পশ্চিমায়ন অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তার একাধারে প্রধান কারণ ও পরিণাম শিল্পবিপ্লব হয়ে ভোগ্যবস্তুর প্রাচুর্য ঘটে নি। মানে, যথোপযুক্ত কাগজ [বন্ধুবর নিমাই চাটুজ্যে যে বস্তুটির বাংলা পরিভাষা করেছেন 'হাগজ'] বরিশালে সুলভ হলে মিত্র-সাহেব সংবাদপত্রের অবমাননা করতেন না।

আমাদের বলিষ্ঠ ভাষা স্থানীয় কৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। ঐ ভাষা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত ছিল না। এক সময় প্রতি বছর টাউন হলে সাংস্কৃতিক সম্মেলন হত— তার 'মাধ্যম' বিশুদ্ধ বরিশালী। এই শুভ অনুষ্ঠানটি দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জন্মের আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ অনুষ্ঠানে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের একটি বক্তৃতার স্মৃতি অনেকের মনে দীর্ঘদিন সজীব ছিল। তাঁদের কাছে শোনা বয়ান যথাস্মৃতি উদ্ধৃত করছি : "আইজ আপনাগো রবীন্দ্রনাথের মিসটিসিজ্‌ম্‌ লইয়া কিছু কমু। ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। একটা কবিতা পড়লেন। ভাবলেন হগলই বোঝছেন। হ্যাসে দ্যাখবেন কিছুই বোঝেন নাই। মনে হইবে ধরিয়া ফ্যালাইছেন। তহন দ্যাখবেন চ্যাং মাছের মত পিছলাইয়া পিছলাইয়া যায়।"

দত্ত পরিবারের এক বালককে নিয়ে সবাই কিছুদিন বড় চিন্তিত ছিলেন। "আমাগো গুষ্ঠিতে এডা আইলে কোত্থিয়া (কোথা থেকে) ? ল্যাহা-পড়ায় [লেখাপড়ায়] এক্‌কালে মন নাই। মা সরস্বতীর লগে ছ্যামড়ার [ছোকরার] ফৌজদারী মকদ্দমা।" বালকের বয়স তখন পাঁচ-ছয় হবে। চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। যথাকালে ছ্যামড়া মা সরস্বতীর সঙ্গে মকদ্দমা মিটিয়ে পরীক্ষাদি পাশ করে। শুল্ক দফতরের বড় কর্তা হয়ে এখন সে অবসর নেওয়ার মুখে। শৈশবে অবশ্যি সে বুর্জোয়া-মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলে শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শ বুকে ধরে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আঁতাঁত স্থাপন করেছিল। বাড়িতে তাকে সাধারণত পাওয়া যেত না। শহরের নানা অঞ্চলে চলমান ছ্যাকরা গাড়ির সারথির পাশে সহ-সারথির ভূমিকায় তাকে দেখা যেত। মুখে তার হামরাহীদের কাছে শেখা গভীর অধ্যাত্ম-তত্ত্বময় গান, "পাতিশিয়ালে বোড়োই খাইলো, লবণ পাইলো কই ?"

এই ব্যঞ্জনাময় মহাসংগীতের তাৎপর্য বহুমুখী। আপাতদৃষ্টিতে সর্বহারা জীবনের চূড়ান্ত বঞ্চনা এবং বিদ্রোহ-প্রবণতা এর প্রতি অক্ষরে বিধৃত। মেহনতী চতুষ্পদ পাতিশিয়াল বুর্জোয়া বাগানের বোড়োই অর্থাৎ কুল খেয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করছে। কিন্তু হায়, শোষণভিত্তিক সমাজের কাছ থেকে লবণ সে ছিনিয়ে নিতে পারে নি ! গানের দ্বিতীয়ার্থে অস্তিত্ববাদী বা existentialist দর্শনের ইঙ্গিত। জীবনে বোড়োই যদি বা মেলে, লবণ আর মেলে না। চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে এই অলঙ্ঘ্য ব্যবধান— জীব-জীবনের এই ত' মূল ট্র্যাজেডি।

একদিন বিদ্রোহী বালককে ধরে জ্যাঠামশায় নসিয়ত করলেন। "ল্যাহাপড়া যে করিস না, হ্যাসে (শেষে) তুই বাডাজোরের বাবুগো মত হবি।" বালকের প্রশ্ন, "ক্যান্, হ্যারা করে কি ?" জ্যাঠামশায়ের উত্তর, "হ্যারা ? হ্যারা হগালে [সকালে] উড্ডিয়া [উঠে] দাঁতন করতে করতে পুহইরের [পুকুরের] পারে বইয়া ভ্যারেণ্ডা ভাজে। হ্যার পর এক ভাণ্ড চিড়া-মুড়ি খাইয়া বাজারে গিয়া মুদীর দোকানে বইয়া থাকে। দুফইর হইলে পুহইরে দুইটা চুবানি দিয়া উড্ডিয়া বকরাইক্কোসের মত অন্নধ্বংস করে। হ্যার পর ঘুম। বিকাল-সন্ধ্যায় তাস-পাশা। হ্যার পর আবার খাইয়া ঘুম।" বালক এই জীবনচর্যার বিবরণ অনেকক্ষণ বিবেচনা করে বলল, "জেড়ু, হেয়ার চাইয়া [তার থেকে] আর সুখ আছে ?"

বরিশালের শিশুকুলে বিবেক-বৈরাগ্য খুবই প্রবল ছিল। একবার কোশ-নৌকায় খাল দিয়ে যাচ্ছি। খালের পাড়ে চার-পাঁচ বছরের একটা ছেলে মাথায় আমের ঝাঁকা নিয়ে চলেছে। খাল পার হবার জন্য কোমরের গামছাটি খুলে মাথায় জড়াল। দিগম্বর বেশে খালে নামতে যাচ্ছে, হোঁচট খাওয়ায় আমগুলি ঝাঁকা উলটে খালে পড়ল। স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির বশে আমরা বললাম, "অ মনু, আমগুলা গ্যালে ?" মনু দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনে স্মিত হেসে বলল, "ভগমানের নীলা খেলা !"

এই সব শিশুদের কারও কারও কানে অশ্বিনী বাবুর দেওয়া চরিত্র রক্ষাবিষয়ক উপদেশও পৌঁছেছিল মনে হয়। নইস্যা নামে এক বালক ঐ লাইনে জেহাদ করতে গিয়ে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হয়। দুপুরে স্নানের সময় সে নদীর ঘাটে বসে থাকত। কোনও পুরুষ মানুষ ধারেকাছে এলেই বলত, "এদিক আইছো ক্যান ? মাইয়ালোগে ছেনান করে, হেইয়া দ্যাখতে ?" কাকে বলছে সব সময় খেয়াল থাকত না। একদিন দুর্ঘটনা ঘটল। দেখা গেল, উপদিষ্ট ব্যক্তি নইস্যার পিতাঠাকুর। তারপর নইস্যার কিছুকাল শয্যাশায়ী থাকতে হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে নইস্যার বয়স তখন পাঁচ। তার বিবেকবোধ, সমাজচেতনা, তথা পরদুঃখকাতরতা, সর্বদাই সজাগ থাকত। একবার সে আমাদের সঙ্গে শহরের বিখ্যাত সিনেমা হাউস 'জগদীশ থিয়েটারে' টারজানের ছবি দেখতে গিয়েছিল। ছবিতে নায়ক সাঁতার কেটে নদী পার হচ্ছে। পেছনে অগ্নিমান্দ্যরোগী কুমীর— যার টারজানে ঘোর অরুচি। কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নইস্যা চেয়ারে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রচণ্ড চীৎকার, "অ টারজান, উড্ডিয়া পড়। তরে কুমীরে খাইলে !" নইস্যার জনহিতৈষণার মূল্য কেউই

কখনও দেয় নি। তাকে কান ধরে জগদীশ থিয়েটার থেকে বের করে দেওয়া হল।

ইংরেজদের বিশেষ গর্ব যে তাদের উদার সংস্কৃতি উৎকেন্দ্রিক বা eccentric মানুষদের সাদরে প্রশ্রয় দেয়। এ ব্যাপারে বরিশাল কিছু পিছিয়ে ছিল না। শহরের বিশিষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অনেকেই উৎকেন্দ্রিকতায় পৃথিবীর যে কোনও লোককে হার মানাতে পারতেন। যেমন ধরুন, কেষ্টভক্ত ভ্যাগাই হালদার। ভ্যাগাই আধ-পাগলা সেজে থাকতেন। তিনি হরিনাম শুনতে ভাল বাসতেন। তাই ছল করতেন যে হরিধ্বনি শুনলে তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধোদ্গম হয়। ফলে ছেলেরা "অ ভ্যাগাই, হরিবোল, হরিবোল" বলে ওঁর পেছন নিত। ভ্যাগাই বালখিল্যদের লক্ষ করে প্রথমে নাকের শিকনি, পরে ঢিল ছুঁড়তেন। শেষে পকেট থেকে বাতাসা আর পয়সা ছিটিয়ে হরির লুট এবং শিশুপালের সঙ্গে 'হরি হরি' বলে উদ্দাম নাচ।

বরিশালের উৎকেন্দ্রিকতায় এই আধ্যাত্মিক প্রবণতা বিশেষ প্রবল ছিল। মহাপ্রভু জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে কৃষ্ণনাম দিয়েছিলেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শরৎ মাস্টার মশায় ইংরাজীভাষাভাষীদের কালীনাম দিতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি রামপ্রসাদের গানগুলি ইংরিজি অনুবাদ করে শ্যামাসঙ্গীতের সুরেই গাইতেন। একটি লাইন এখনও হৃদয়ে বিঁধে আছে— ''Oh mind! You know no cultivation.'' বাঁ কানে হাত দিয়ে ডান হাত বিস্তার করে 'কাল্টিভেশা-আ-আ-ন' বলে দীর্ঘ তান জুড়তেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সাংস্কৃতিক বিনিময়ের দিকে ওঁর খুবই ঝোঁক ছিল। এ যুগে হলে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ICCR ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ওঁকে লুফে নিত। মাঝে মাঝে উনি ক্লাসে ঢুকে আমাদের ইংরাজি বিদ্যা পরীক্ষা করতেন। "ক' দেহি এর ইংরাজী কি হইবে?" বলে বোর্ডে লিখতেন, "খায় আর কোন্দে।" আমরা নীরব থাকতাম। বিজয় গর্বে উনি ''eats and jumps'' বলে সলাফে বেরিয়ে যেতেন। শোনা যায় উনি বাংলাভাষাজ্ঞানাভিমানী এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকেও ঘায়েল করেছিলেন। শরৎ মাস্টারের কূটপ্রশ্ন, ''Tell me, sir, the English for খাইয়া দাইয়া শোগা-উব্বুত।" ম্যাজিস্ট্রেট অনেক ভেবে বললেন, "হাঁ। বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি। শোকাভিভূটো ! overwhelmed with grief.'' সাহেবের একটু ভুল হয়েছিল। বরিশালী patois-এ 'হ-' স্থলে 'শ' আদেশ হওয়া ব্যাকরণসম্মত। "আহারান্তে পশ্চাদ্দেশ ঊর্ধ্বদিকে দিয়ে শয়ন"— মাস্টারমশায়-উল্লিখিত ব্যাসকূটের ব্যাখ্যা এই।

উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এন. ডি. বীট্‌সন্-বেল [বরিশালবাসীরা নামটির সরল বঙ্গানুবাদ করে —'নন্দদুলাল ঘণ্টা বাজায়'] সাহেবের গায়েও কিছুটা শহরের হাওয়া লেগেছিল। ওঁর নোটবুকে বাংলা গালিগালাজ সযত্নে টোকা থাকত। প্রয়োজনমত সেগুলো ব্যবহার করতেন। স্বদেশীওয়ালাদের উপর ওঁর বেজায় রাগ ছিল। একদিন সকালে অশ্বপৃষ্ঠে নদীর পাড়ে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ দেখেন ওঁরই খাস কেরানি খদ্দর গায়ে ঘুরছে। আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া? কেরানীকে থামিয়ে নোটবুক খুলে শকার-বকারাদি যাবতীয়

গালি-গালাজ পাঠশালার হেড পড়ুয়ার সুরে পড়ে শোনালেন। তারপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে মনে পড়ল নতুন শেখা একটা অত্যন্ত দরকারি গাল উনি উল্লেখ করেন নি। ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসে কেরানিকে আবার ধরে ফেললেন। বললেন, "শুন, শুন, তুমি হারামজাদাও আছ।"

উৎকেন্দ্রিকদের প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কচিদা উল্লেখযোগ্য। লোকে বলত এক সময়ের ভাল ছাত্র কচি গাঁজা খেয়ে পাগল হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, কথাটা ভুল। আক্ষরিক অর্থেই গাঁজার ধোঁয়ার পর্দা টেনে তার আড়ালে উনি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা এবং স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন। উনিই এ যুগের হিপিদের আদর্শগত পিতামহ। ওঁর পাগলামি গতানুগতিক জীবনযাত্রাকে জিভ ভেঙান ছাড়া কিছু না। জমিদার যোগেন সেন মশায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উনি বক্তৃতার সুরে বলতেন, "শুইন্যা রাখো, শুইন্যা রাখো, বিলম্বে হতাশ হবা। যোগেন স্যান, সুরেন স্যান, ধীরেন স্যান— তিন ভাই। তে পাঁচা পনের পয়সা, পৌনে চার আনা।" এই মূল্যায়নে উক্ত তিন ভাই এবং তাঁদের পরিবারস্থ ব্যক্তিরা সন্তুষ্ট হতেন মনে হয় না। সর্বজনপ্রিয় কালাভাই নতুন রেস্তোরাঁ খুললেন, "Baron Restaurant।"কচি নিজেকে তার অবৈতনিক প্রচারাধ্যক্ষ নিয়োগ করলেন। ঠিক ভিড়ের সময়টা রেস্তোরাঁর বাইরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "এই ব্যারন রেস্টুরেন্টে অতি উৎকৃষ্ট গাঁজা পাওন যায়। আমি প্রত্যহ খাই। আপনারাও খাইবেন। শরীর মন ভাল থাকবে। চরিত্রের উন্নতি হইবে।" কি উপায়ে তাকে শেষ অবধি নিরস্ত করা হয় জানি না। কয়েক বছর অদর্শনের পর হঠাৎ একদিন বিবির পুকুরের পাড়ে কচিদার সঙ্গে দেখা। মুখটা কানের খুব কাছে এনে ফিস ফিস করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বোZলা কিছু ?" বিনা দ্বিধায় উত্তর দিলাম, "না। কচিদা গলা আরও নামিয়ে বললেন, "আমিও না।" তারপর "আমিও না" বলে হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে অদৃশ্য হলেন। কচিদা, যেখানেই থাকুন শুনে রাখুন, "কিছুই বোZলাম না, বোZবার আর ভরসাও রাখি না।"

এই রচনার প্রথমেই বলেছি, —বরিশালী সংস্কৃতির সব চেয়ে লক্ষণীয় প্রকাশ প্রচণ্ড পৌরুষে। Machismo কাকে বলে ল্যাটিন আমেরিকার বাঘা বাঘা পুরুষ তথা মার্কিন গুণ্ডাবীর র‍্যামবো তা' বরিশালবাসীর কাছে সাত জন্ম শিখতে পারে। এই machismo শুধু পুরুষ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দামু কাকার দুই বৌ যখন সম্মিলিত শক্তি নিয়ে তাঁকে ঝাঁটাপেটা করতেন তখন সে দৃশ্য দেখলে অনেক পুরুষসিংহেরই পিতৃনাম বিস্মরণ হত, আদর্শগত শুচিতা ভুলে নারী আন্দোলনকারিণীরা 'দামুরক্ষা সমিতি' খুলতেন। আর ভুললে চলবে না, অন্তার খিস্তিপুরাণের পিছনে আদ্যাশক্তি হিসাবে কাজ করত সেজ ঠাকুমারই প্রেরণা। বরিশালের স্বাধীন চিত্ত ভাষা ও ভাবভঙ্গীতে সততই প্রকাশ পেত। বহু মুখে বহুবার শুনেছি, "ক্যান, ঠ্যাকলাম কিসে ? আমি কারও মাহা [মাথা] তামাক খাই ?" কারও মাথা তামাক খেলে তার দাসত্ব স্বীকার করতে হয়, নৃতত্ত্ববিদরা এই ব্যবস্থার কোনও নজির এখনও কোথাও পান নি। প্রকৃতপক্ষে যারা তামাক মাখত তারা অতি দীনদরিদ্র মিচকিন-মোবারক

মানুষ। কিন্তু আসল বক্তব্য, বরিশালবাসী কোনও দুর্মূল্য সুযোগ সুবিধার বিনিময়েই স্বাধীনতা বিক্রয় করতে নারাজ, এ জন্য বহু আয়াসে সে নিজের তামাক নিজেই আজীবন মাখতে সর্বদা প্রস্তুত। কবি বোধ হয় বরিশাল থেকে ফিরে এসেই লেখেন, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।"

বরিশালের দোকানদারদের শির বিশেষ করে উচ্চ ছিল। দোকান তার সম্ভ্রমের দুর্গ, তুচ্ছ জীবিকা উপায়ের পথ না। হারাবংশী বীর কুম্ভের মত জান দিয়ে সেই দুর্গ সে রক্ষা করত। এই মহৎ আদর্শের পাশে কেনা-বেচার ব্যাপারটা নেহাতই গৌণ, নিম্নকোটির ব্যাপার। খরিদ্দার ঢুকল, দোকানি অসম্ভব দাম বললেন। তারপর প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ। খরিদ্দার : "ঠ্যাকলাম কিসে ?" দোকানি : "হেয়া আপনে জানেন," খরিদ্দার, "হেইলে [তা হলে] আমি হাড্ডিয়া যাই [হেঁটে চলে যাই]।" দোকানি : "হেইলে হাড্ডিয়াই যান।" পরাজিত খরিদ্দার নতমস্তকে বের হয়ে গেল। দোকানির মুখে বিজয়ীর হাসি। পিতৃপুরুষের সম্মান আরও একবার বজায় রইল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিংয়ের নীচের তলায় কয়েকটা ঘর ভাড়া দেওয়া ছিল। এক সময় শুনতাম, এই বিসদৃশ ব্যবস্থার ফলে যা আয় হত তাতে কয়েক জন অধ্যাপকের মাইনের জোগাড় হয়ে যেত। ঐ ঘরগুলির একটায় ইস্টবেঙ্গল সোসাইটির কাপড়ের দোকান ছিল। সেখানে একদিন একটা শার্ট কেনার ইচ্ছা নিয়ে ঢুকেছিলাম। দেখলাম কর্মচারি দুটি গভীর বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন। ভাষা বরিশালি। অনেক সাহস করে দু-তিন বার জামা কেনার কথাটা তোলার পর, আলাপ মুহূর্তের জন্য মুলতুবী রেখে বিক্রেতাদের একজন বললেন, "আপনার গায়ের মাপের হইবে না।" তা সত্ত্বেও দেখতে চাওয়ায় ঘোর বিরক্তির সুরে তিনি ঊর্ধ্বমুখে কার দিকে যেন একটা কথা ছুঁড়ে দিলেন, "ফইডকা, [ফটিকের অপভ্রংশ] শার্ট এক বস্তা ফ্যালাইয়া দে। ভদ্দরলোকেরে কইখে আছি তেনার গায়ে হইবে না, তবুও হাউশ [সখ], তিনি দ্যাখবেন।" 'হাউশ' সংবরণ করে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

অবশ্যি পাকা রাজনীতিবিদদের মত অপ্রত্যক্ষ ভাবে কথা বলে কাজ সেরে নেওয়ার ক্ষমতাও আমাদের ছিল। ইংরেজদের খ্যাতি আছে যে তারা অতিশয়োক্তির উল্টোটা, understatement-এর বিশেষ ভক্ত। কারও ঠ্যাং দুটো কাটা পড়লেও বলবে "ঐ একটু ছড়ে গেছে।" কিন্তু এ ব্যাপারে বরিশালবাসীর তুলনায় তারা নিতান্তই শিশু। কীর্তিপাশার রসাকাকা কলকাতায় এসছেন। রাসবিহারী এভিন্যু দিয়ে চলেছি, কাকার অঙ্গে তাঁর চির-অভ্যাসগত রাজবেশ। অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত তোলা আধ-ময়লা ধুতি, কোমরে বাঁধা একটি লাল গামছা, গা খালি। হঠাৎ মুখের চেহারা উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোমরের গামছা খুলে নিয়ে শীর্ণকায় একটি মানুষের উপর কেঁদো বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন। তারপর শিকারের গলায় গামছা দিয়ে কুশলপ্রশ্ন করলেন, "সা-আ-রামজাদা, আমার টাহাটা কবে দেবা ?" অনেক কষ্টে বিষয়চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করে রসাকাকাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। একটু মুচকে হেসে খুড়ামশায় ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন, "বোঝলা না, টাকাটা অনেকদিন হইল লইছে, ফেরত দিতে আছে না, তাই একটু indirectly কইয়া দিলাম।"

কলকাতার ইস্কুলে বছর দেড়েক কাটিয়ে শেষটায় বরিশালের 'জেলা ইস্কুলেই' বিদ্যার্জন করতে হয়। কলকাতা-প্রত্যাগত পৌরুষহীন ছেলেদের প্রতি, —বিশেষত তাদের অবলিষ্ঠ ভাষা সম্বন্ধে,— স্থানীয় পড়ুয়াদের গভীর অবজ্ঞা। 'টিফিনের' সময় কিছু জল-খাবার ইস্কুল থেকেই দেওয়া হত। একদিন আম বিলি করা হয়েছে,খেতে শুরু করেছি। সহপাঠি একজন প্রশ্ন করলেন, "লাগতাছে ক্যামন ? মিষ্টি মিষ্টি না চুকো চুকো ?" অর্থাৎ বইরশালের লোক এ রকম ন্যাকা-ন্যাকা নরম-নরম কথা বলে না। তারা শক্ত কথা বলে, শক্ত জিনিস কড়মড়িয়ে খায়। ইস্কুলে যে সব জিনিস কড়মড়িয়ে খেতে হত তার মধ্যে একটি ছিল জোড়া-সন্দেশ। চ্যাপ্টা দুটি চিনির ডেলা কিঞ্চিৎ ময়দা বা ছানার অনুপান দিয়ে একটু মোলায়েম করে একসঙ্গে এঁটে দেওয়া। এ বস্তুটি সর্বজনপ্রিয় ছিল। সহপাঠিরা উৎসাহ দিয়ে বলত, "অ কইলকাত্তিয়া পোলা, খাইয়া দ্যাখ্। সাধ্য মেশডো।" অর্থাৎ মানুষের সাধ্যে যতটা মিষ্টি করা সম্ভব, বস্তুটি তার চরম সীমায় পৌঁছেছে। মানে, যার পরো নাস্তি। ঐ জোড়া সন্দেশ সম্পর্কে বরিশালবাসী বিশেষ গর্বিত ছিল : "সন্দেশ মোরগো গৈলার। খাইয়া খাও এক ঘডি জল।"

মাস্টার-মশাইরা বঙ্গভূমির নানা অঞ্চল থেকে এলেও পদ্মার পূর্ব পাড়ের লোকই তাঁদের মধ্যে বেশী ছিলেন। ফলে ইস্কুল সংস্কৃতি ভাষা ও উচ্চারণ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ছিল। একজন মাস্টার মশাই রবীন্দ্র কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি বৃষ্টি নামলেই জানলার দিকে তাকিয়ে গভীর দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতেন, "ওরে আইZ তরা, Zাইসনেগো তরা, Zাইসনে ঘরের বাহিরে।" আরবির মৌলবী সাহেবের কথা শুনলে হতভাগ্য মতিন কিছুতেই হাসি চাপতে পারত না, মুখে কাপড় দিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে মরণোন্মুখ খ্যাঁকশেয়ালের মত একটা আওয়াজ তুলত। মৌলবী সাহেব পাকা গোয়েন্দার মত কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেন—ওটা হাসির আওয়াজ। তারপর অপরাধী সনাক্তকরণ : "হাসস্ কেরে ? হাসস্ কেরে ? মতিন মিঞা নাকি রে ? মানুষ হইসস্ ? প্রাণে মহর্‌রম জাগিছে ?" আমরা জানতাম—মহর্‌রম মাসে হাসান-হোসেনের স্মৃতিতে যে জলুশ বের হয় সেটা উৎসব হলেও তার উৎস শোকের স্মৃতি। কিন্তু মৌলবী সাহেব মতিনের চিত্তে যে অবৈধ উল্লাসের আভাস পেতেন, ওঁর অলঙ্কার শাস্ত্রে তার একমাত্র তুলনা মহর্‌রমের উদ্দাম শোকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে। অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি ঘোষিত হত : "এক্‌কই থাবড়ে মাথার মগজ ফানি [অর্থাৎ পানি] করি দিম্।" [বঙ্গানুবাদ : একটি চড়ে মাথার মগজ জলীভূত করে দেব।] মতিনের ফ্যাক ফ্যাক যতই বাড়ত, এক না, বহু থাপড়ে ওর মাথার মগজ ফানি করার প্রচেষ্টাও সমান তালে চলতে থাকত। অবস্থাগত নজির বা circumstantial evidence থেকে মনে হয়, মৌলবী সাহেবের চেষ্টা সফল হয় নি।

নোয়াখালি-সন্তান ইতিহাসের শিক্ষক মশায়ের কাছে লেখক নানা সূত্রে ঋণী। ওঁর উচ্চারণভঙ্গী বাংলা অক্ষরে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব না। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। উনি বাংলা 'প' এবং 'চ' অক্ষর দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের অজ্ঞাত দুটি dipthong-এর মত উচ্চারণ করতেন—যথাক্রমে 'ফ্‌হ' এবং "চ্‌ছ"র মত

শোনাত। উদাহরণ "চ্ছ্যাথামের ফ্হুত্র উইলিয়াম ফ্হিট [চ্যাথামের পুত্র উইলিয়াম পিট]।" উনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাইকে 'মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন। লেখককে বিশেষ স্নেহ করতেন। ক্লাসে প্রশ্নগুলি অনেক সময়ই আমার প্রতি উদ্দিষ্ট হত : "তফ্হন্ মিঞা কও চ্ছাই" [অর্থাৎ তপন মিঞা, বল দেখি]। ওঁর একটি অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য করে জীবনের নানা ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছি। "লিখ্বা যহন চ্ছাই, ফ্হ্যারা বাই ফ্হ্যারা, ফ্হয়েন্ট বাই ফ্হয়েন্ট লিখবা।" [বুঝলে, যখন লিখবে, প্যারা [গ্রাফ] বাই প্যারা [গ্রাফ], পয়েন্ট বাই পয়েন্ট লিখবে।] পাঠিকা/পাঠক, হয়ত লক্ষ্য করেছেন, বর্তমান রচনাটিও যথাসম্ভব ফ্হ্যারা বাই ফ্হ্যারা ফ্হয়েন্ট বাই ফ্হয়েন্ট লিখবার চেষ্টা করেছি।

ফার্সির মৌলবী সাহেবের কাছে ফারসী গদ্য-পদ্যর সরল বঙ্গানুবাদ শুনে শুনে ভাষাটা সহজেই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। 'দেলশ্ বোলন্দ্ বুদ্' কথাটির ব্যাখ্যা করতেন, "বোZলা ত ? তেনার দেল খুব বোলন্দ আছেলে।" বুঝতে আর কিছু বাকি থাকত না। সব প্রাঞ্জল হয়ে যেত। শেখ সাদীর গোলেস্তাঁর একটি আপ্তবাক্য বড় সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। "দরুগ্-এ মেছ্লেহত্-আমিজ্ বেহ্ আজ রাস্ত্-এ ফেত্নাহ্-আনগিজ্।"* "বোZলা তোমরা ? শেখ্ সাদী কইথে আছেন, যে দরুগে মেছলেহত চাইগা ওডে হেয়া ফেত্নাহ চাগাইন্যা হাচা কথার চাইয়া অনেক ভাল।" বাঙালীর ফার্সী বিদ্যার ব্যঙ্গ করে কিছু বয়াত-ও ওঁর তহবিলে ছিল। যথা—

শব্-এ দিগর্ রফতাহ্ বুদম্, তুই না ছিলি ঘরে-রে।
সাগ্-এ তোরা ঘেউ ঘেউ কুনাদ্ মান্ গেরেখ্তম্ ডরে-রে।

এই ফার্সী-বাংলা প্রণয়-কাব্যের অর্থ—এক রাতে তোর ঘরে আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু তোর কুকুর ঘেউ ঘেউ করার ভয়ে আমি পালালাম। একটি 'শিশুপাঠ্য' কবিতা দিয়ে উনি ফার্সী বিদ্যাদান শুরু করতেন :

করিমা বেবখ্শাহ্ বর্ হাল্-এ মা
কে হাস্তম্ আসীর্-এ কামান্দ্-এ হাওয়া।

"কামনা-বাসনার খাঁচায় বদ্ধ এই আমার উপর দয়া কর, হে করুণাময়।" যে বয়সে এই অমূল্য প্রার্থনা শিক্ষা করি, সে বয়সে জলছবি, মারবেল, রসগোল্লাদি পার্থিব বস্তুর প্রতি কামনা-বাসনা সত্যিই বড় প্রবল থাকে।

সংস্কৃতের পণ্ডিত মশায় শিখিয়েছিলেন পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দ সংস্কৃতে ধাতুগত ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, "মূলং জানাতি ইতি মৌলানা", "ইষ্টং পিনদ্ধি ইতি ইষ্টুপিডঃ।" আমরা জাতিতে বদ্যি বলে পণ্ডিত মশায় ঠাট্টা করে একটা শ্লোক শোনাতেন : "নমস্তুভ্যং বৈদ্যরাজং যমরাজস্য সহোদরং। যম গৃহ্লাতি প্রাণানি, ভবান্ প্রাণানি ধনানি চ।** তাঁর কাছে শেখা উদ্ভট

* বঙ্গানুবাদ : যে মিথ্যাকথায় সম্প্রীতি বাড়ে তা কলহবর্ধক সত্যকথার চেয়ে ভাল।

** বঙ্গানুবাদ : যমরাজের সহোদর হে বৈদ্যরাজ, আপনাকে নমস্কার। যম প্রাণ নেন, আপনি প্রাণ ও ধন দুইই।

শ্লোকগুলির কিছু কিছু বরিশালি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। যথা—

"এষাশা ত্বং মহাভাগ।
ভবাশু প্রতিপালকঃ ॥
কামারি রবতু নিত্যং।
তৃতীয়াক্ষরবান্ ভব ॥"

"হে মহাশয়, আমাদের আশা আপনি শীঘ্র আমাদের প্রতিপালক হোন্। মদনভস্মকারী শিব আপনাকে সর্বদা রক্ষা করুন। আপনি এই শ্লোকের প্রতি পঙক্তির তৃতীয় অক্ষরগুলি জুড়লে যা হয় তাই,—অর্থাৎ শাশুরিয়া, হোন্।"

কি কারণে জানি না 'শাশুড়িয়া' অর্থাৎ 'শাশুড়ির অবৈধ প্রেমিক' এই গালটি বরিশালে ঠাট্টা করে বাপ-জ্যাঠারা ছেলে-ভাইপোদের এবং শেষোক্তরা বাপ-জ্যাঠাদের বলত। অবশ্যি যে শব্দটা উচ্চারণ করা হত তা 'শাশুড়িয়া' না 'হাউরিয়া'। নৃতত্ত্ববিদরা বলেন, পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতেই যে আত্মীয়-কুটুম্বদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়, মাঝে মাঝে সেই অতি দূরত্বের পরিপূরক বা প্রতিষেধক হিসাবে তাঁদেরই সম্মানের বদলে অসম্মান করার ব্যবস্থা থেকে। যেমন উত্তর ভারতে হোলির দিনে অ-দ্বিজ হিন্দুদের মধ্যে বাড়ির বউরা শ্বশুর-ভাশুরকে সাধ্যমত ঠেঙায়। কিন্তু বাপ-জ্যেঠাকে শাশুড়ে বলার প্রথা পৃথিবীর অন্য কোনও অঞ্চলে আছে বলে শুনি নি।

সংস্কৃতের চর্চা বরিশালে বোধ হয় বহুব্যাপী ছিল। সেরেস্তার নায়েব মশায় একটা কঠিন শ্লোক প্রায়ই শোনাতেন:

হবর্তাবা কহিপ্তাসা ডজেগে নশকেড়ুব্র।
আন্ডি ইব অভ্রুফে নম্যাস্টস্টে সীবাঙ্গব ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা, বঙ্গবাসী স্টেটসম্যান্ ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া। এডুকেশন গেজেট সাপ্তাহিক বার্তাবহ ॥ শ্লোকটি উল্টে পড়লে তবেই এই অর্থ প্রতিভাত হয়। ওঁর আর একটি প্রিয় পদ ছিল:

শীতেতে কাঁকুড়ি-মাকুড়ি মাঘ মাসস্য রাত্রৌ।
কম্বাং ভারে বাপুরে মাগোরে লইয়া আয়ো চায়ের পাত্রৌ ॥

বলে বলতেন, "'পাত্রৌ' কেন বোঝলা?" উত্তর: "না।" প্রত্যুত্তর: "এয়াও বোঝলা না? দ্বিবচন! নরঃ নরৌ নরাঃ। মাঘ মাসের রাত্তিরে এক পাত্তর চায়ে হইবে কি? হেইয়ার লইগ্‌গা 'পাত্রৌ'।" ইংরাজী সাহিত্যেও ওঁর দখল ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্পে'র একটি বিখ্যাত ইংরিজি বাক্যর পাঠান্তর প্রথম ওঁর কাছেই শুনি,—কবির রচিত গল্পটি ছাপা হওয়ার অনেক আগে। বাক্যটি নিম্নরূপ, ''How can I succendify the huberfluous character of Akbar whose demagogous fatatulation was dimendically lassaturated by the vovacity of Lugzufarus''—'Jabberwocky' মনে পড়ে? ''It was brillig and the mamsy toves did gyre and gimble in the wabe.''

বরিশাল-সংস্কৃতির আলোচনায় স্থানীয় গণ-চেতনা বিষয়ে কিছু না বললে লেখক যে প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীর লোক, তা পুরোপুরি প্রমাণ হয়ে

AMARBOI.COM

যাবে। কথাটা অন্তত কিছুটা ধামাচাপা দেওয়া দরকার।

বরিশালের যে সব মেহনতী মানুষের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় আমাদের ঘেসেড়া, যে ব্যক্তি শহরের বাড়ির ঘোড়া ও গরুদের [লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, আমাদের শহরের বাড়িতেও গুটিকয় গাভী ছিল, যাদের সন্তানদের বঞ্চিত করে আমরা দুগ্ধপান করতাম। Veganদের বলবেন না, বাড়ির সামনে ভুখা হরতাল করবে] জন্য ঘাস কাটত, সেই মেনাজদ্দি সম্পূর্ণ সর্বহারা ভূমিহীন কৃষক ছিল। তার প্রকৃত নাম কি কেউই জানত না, সম্ভবত মিনহাজউদ্দিন [হ্যাঁ, সেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যিনি রায় লখমনিয়া বা লক্ষ্মণ সেনের কেলেঙ্কারির কথা লিখে গেছেন, তাঁর নামই বটে]। যাহোক, আমাদের ঘেসেড়া মেনা নামেই পরিচিত ছিল। মেনা বলত, "আকাশটা এককালে পিরথিমির উপরেই আছেলে, পেরকাণ্ড এড্ডা বাটির মত। চাষার বৌ রোজ উঠান ঝাইড় দ্যায়, আর ঝাটাটা আকাশের কাণায় ঠেগে। একদিন খসমের লগে ঝগড়া করিয়া বৌ-এর মেজাজটা খারাব। ঝাটাটা আকাশের কাণায় লাইগ্‌গা ভাল মতে ঝাইড় দিতে পারে না। হ্যাসে [শেষে] চট্টিয়া মট্টিয়া এক ঝাটার বাড়ি মারছে। হেই যে আকাশডা ঝাটার বাড়ি খাইয়া উপারে উড্ডিয়া গেল, আর নামলে না। হেইখানে উব্বুত হইয়া ঝুলিয়া রইলে। আর এতকাল টুনীপক্ষীরা মাইনষের মত উব্বুত হইয়া ঘুমাইত। [বিঃ দ্রঃ : শ্রেণীশত্রুদের মত নানাভঙ্গীতে ঘুমান সর্বহারা জীবনে বিরল বিলাস। তারা শুধু উব্বুত অর্থাৎ উপুড় হয়েই শোয়।] য্যামনে আকাশডা উপারে উড্ডিয়া গ্যালে, ত্যামনে টুনিপক্ষী চিত্তর হইয়া ঠ্যাং উচা করিয়া শুইতে লাগলে। যদি আকাশডা ভাইঙ্গা পরে, হেইলে [তা হলে] পাও দিয়া ঠেকাইয়া দিবে।" মেনার জাগতিক বুদ্ধি তার বিশ্বচেতনার মত গভীর ছিল না। বর্ষাকাল, মেনা গরু নিয়ে নদীর পারে ঘাস খাওয়াতে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। কাক-ভেজা ভিজে মেনা বাড়ি ফিরে এল, সঙ্গে গরু নেই। "অ মেনা, গরুগুলা কই রাইখ্যা আইলি ?" "আইগ্‌গা ভিজিয়া যাইবে। হেইর লইগ্‌গা হইচ্চা [ছাতা] লইয়া যাইতে আইলাম।" মেনার ঈশ্বরভক্তি বিশিষ্ট অঙ্গের মারফতি গানে প্রকাশ পেত :

বড় বড় বিচা ক্যালা, পয়দা করছেন আল্লাহ্ তালা,
বান্দারা তার পাস্থা দিয়া খাইবে।

মেনার একটি গানে ননীচোর কৃষ্ণ ঠাকুরের বাল-লীলার প্রভাব স্পষ্ট :

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করহো তোমরা
আল্লা নাইরে ঘরে।
বাইগণ ক্ষ্যাতে গিয়া আল্লাহ্ বাইগণ চুর্‌হি কর্‌হে।
গীত বান্ধলে মানিক পীহি-ই-ই-র।

দিন-দুনিয়ার মালিক গরীব চাষীর ক্ষেতে লীলাচ্ছলে বার্তাকু হরণ করছেন—এই কথা কল্পনা করে মেনা অশ্রুজলে ভাসত। ধর্মোচ্ছ্বাস বেশী হলে শুধু গানে শানাত না, মেনা তৎসহ ফকিরি নাচ শুরু করত এক হাত মাথায়, এক হাত কোমরে দিয়ে :

"লও রে আল্লার নাম, নবী কর্‌হও সার।

মাজা দুলাইয়া চল্লিয়া যাবা ভবনদীর পার।
সেই ত মাণিকপীহির পারে যাইবার না।
জয়নাল ফকির হইলে ফেনি খাইলে না।"

ফেনি নামধেয় অতিকায় বাতাসা আমাদের বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। তাই জয়নালের এই ভীষ্মতুল্য আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে শিহরিত হতাম।

কীর্তিপাশা গ্রাম থেকে ভুডি মেঞা নামে এক পলিতকেশ বৃদ্ধ প্রায়ই শহরে আসত—এক করুণ আরজি নিয়ে এবং বাবুদের দরবারে ফয়সলার আশায়। ভুডির বালিকা বধূ তার সঙ্গে ঘর করতে নারাজ ; তার তরুণ বৈমাত্রেয় ভাইকে নিকাহ্ করতে চায়। সজল নয়নে ভুডি এই শোকগাথা বাবুদের শোনাত। উপসংহারে বলত, "মআরাZ, এই হইলে আমার হিষ্টিরিয়া ;" বাবা বলতেন, "ভুডি, তর কি ভীমরতি ধরছে ? তুই ওর জ্যাডার বয়সী, ওরে কি ঘরে রাখতে পারবি ? ও চাইতে আছে, দে না তালাক দিয়া। শান্তিতে থাকবি হ্যানে।" ভুডি এই নিষ্ঠুর উপদেশ শুনে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠত : "এয়া কইবেন না হুজুর। অরে আমি কোলে-পিডে করিয়া মানুষ করছি।"

শৈশবে চারটি দরিদ্র মানুষকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে জানতাম। প্রথম—'হতভাগিনী যতিবালা' ওরফে যতিদিদি। আসল নাম সম্ভবত জ্যোতিবালা, কিন্তু তার পানের কৌটোর উপর যতিবালাই লেখা ছিল।

আর ঐ চারটি অক্ষর লিখে সে নাম সই করতে পারত। তার মুখে শুনেছি, তিন বছর বয়সে মুর্শিদাবাদ জেলার গয়েশপুর গ্রামে যতিবালাকে থালায় বসিয়ে পাঁচ বছরের একটি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ক' মাস পরে "মার দয়া" অর্থাৎ বসন্ত হয়ে ছেলেটি মারা যায়। তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়ে যতিদিদি লেখকের ঠাকুর্দার আশ্রয়ে আসে—তাঁর মা-মরা এক মাসের মেয়েটির লালন-পালন করতে। আমাদের সংসারে এই মোটাসোটা মানুষটির জায়গাটা ছিল পরিবারের লোক এবং ঠাকুর-চাকরদের মাঝামাঝি অনির্দিষ্ট কোনও এক ধাপে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের নানা মুখরোচক গরীবি রান্না সে আমাদের রেঁধে খাওয়াত। তার আকারের সঙ্গে তার সৌন্দর্যবোধের একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ ছিল। রূপসীদের বর্ণনায় তার বাঁধা গৎ, "দিব্বি সোন্দর গোলগাল মোটাসোটা।" যতিদিদির হয়ে তার বোনপোকে মাসে একটা করে চিঠি লিখতে হত। বয়ানটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল : "ভাই কালিপদ, ধান-পান ছেলেপুলে সব কেমন আছে জানাইবা, আমার শরীর মোটেই ভাল না। কতদিন আর বাঁচিব জানি না। এখন গ্যালেই ভাল। তোমাদের মঙ্গল দিবা। ইতি আং তোমাদের মাসী, হতভাগিনী যতিবালা। ঠিকানা— গ্রাম গয়েশপুর, পোস্টাফিস এরুয়ালি, জিলা মুর্শিদাবাদ।" যতিদিদির অক্ষর-পরিচয় ছিল। সে ছোট ছোট কতগুলি বই থেকে মুক্তাচুরি, নৌকাবিলাস, কালীয়দমন ইত্যাদি কৃষ্ণলীলার কাহিনী পড়ে শোনাত। আর সকালসন্ধে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম উচ্চস্বরে জপ করত। ভক্তিতে দু গাল বেয়ে চোখের জল পড়ত। দেখে হি-হি করে হাসতাম। যতিদিদি বলত, "ছি সোনা ! অমন হাসতে নেই।" মাঝে মাঝে ভাঙাগলায় কীর্তনাঙ্গ বৈষ্ণব গান শোনাত, "অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় রে।

অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় রে।" বাড়িতে যাঁরা যাওয়াআসা করতেন তাঁদের মধ্যে এক নিত্যানন্দ বাবু ছিলেন। পথেঘাটে তাঁকে নানা জায়গায় দেখতাম। ভাবতাম যতিদিদি তাঁর কথাই বলছে। শুধু 'অক্রোধ' আর 'অভিমানশূন্য' কথা দুটোর অর্থবোধ হত না।

যতিদিদিকে সুযোগ পেলেই খেপাতেন বিচিত্র গুণসম্পন্ন এবং বিচিত্র স্বভাবের একটি লোক—শীতল জ্যাঠা। শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় জনপ্রিয় চিত্রকর হিসাবে খ্যাত ছিলেন। গল্পের বইয়ে ছাপা ছবির কোণায় 'শীতল' নামটি প্রায়ই দেখা যেত। আর ওঁর আঁকা কৃষ্ণলীলার oleograph বাজারে খুব চলত। বরিশাল অঞ্চলে কীর্তনীয়া হিসাবেও ওঁর খ্যাতি ছিল। সখ করে পাথর কেটে মূর্তিও তৈরী করতেন উনি। লেখকের ঠাকুর্দার কাছে মানুষ এই ব্রাহ্মণবটুর বহুমুখী শিল্পপ্রতিভা সবই প্রকৃতির দান, কারও কাছে শেখা না। শুনেছি হ্যাভেল সাহেব ওঁর হাতের কাজ দেখে আঁকা শেখবার জন্য ওঁকে ইটালী পাঠাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু শীতল জ্যাঠা রাজী হননি যেতে। উনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে পড়ে LMS হয়েছিলেন। সময়টা কাটাতেন বেশীর ভাগ নিজের খেয়াল-খুশীতে। পুত্র-পরিবারকে গ্রামে রেখে মাসের পর মাস আমাদের কাছে থাকতেন। আবার উধাও হয়ে যেতেন। তারপর বৎসরাধিককাল নিরুদ্দেশ। ওঁর আসার অপেক্ষায় আমরা উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। উনি এলে ঘুম ভাঙত ওঁর গোষ্ঠলীলা কীর্তনে "পীতধরা পড়ি আয় রে কানাই শ্রীদাম সুদাম ডা-আ-কে-এ"। সন্ধেবেলা খবরের কাগজ কেটে নানা ছবি বানিয়ে, তারপর একটা সাদা কাপড়ের পেছনে লণ্ঠন রেখে ছায়াবাজী দেখাতেন। বিচিত্র কৌশলে কাগজের ছবিগুলির ছায়া ফেলে একটা কাহিনী শোনাতেন। রাত্রে ঘুমোবার আগে আরও গানসহ গল্প, —মদনকুমারের কাহিনী, গুণাবিবির কেচ্ছা, রাইডার হ্যাগার্ডের আয়েষা ইত্যাদি। এবং মাঝে মাঝে 'সাহেবী গান' শোনাতেন : "নটাং না, নটাং না-আ। চিমঠাইও না, চিমঠাইও না। আরে ব্যাটা, আরে ব্যাটা।" নিজের খুশীমত উনি ছবি আঁকতেন, গান গাইতেন, গল্প বলতেন, সখের থিয়েটারে অভিনয় করতেন। খ্যাতি নিয়ে ওঁর মাথাব্যাথা ছিল না। তাই ওঁর নাম কেউ মনে রাখেনি। ওঁর সহজাত প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন ওঁর এক দৌহিত্রী,—খ্যাতনামা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

শীতল জ্যাঠা আবালবৃদ্ধ সবাইকে খেপাতে ভালবাসতেন। সেই খেপানর মধ্যেও ওঁর কল্পনাশক্তির ছাপ ছিল। আমাদের বলতেন, "মূর্খের ডিম"। ওঁর খেপানর প্রধান শিকার ছিল যতিদিদি। যতি পুঁইশাক তুলছে, শীতলজ্যাঠা কীর্তন ধরলেন,

"শাক তুলিতে পড়িয়া গেল সারা রে।
দিয়া মোটামোটা বাহু লাড়া রে।"

আমাদের সঙ্গে উনি কক্সবাজারে বেড়াতে গিয়েছেন, সেখানে লাল কাঁকড়ার খুব প্রাচুর্য। উনি আমাদের বোঝালেন, —যতি কাঁকড়া রাক্ষুসী, রোজ রাত্রে সমুদ্র সৈকতে গিয়ে সে কাঁকড়া চিবোয়। ওর চিবুকের টোলটি আসলে কাঁকড়ার অন্তিম কামড়ের দাগ। কথাটা বিশ্বাস করে কদিন যতিদিদিকে একটু এড়িয়ে

চললাম। এ সব ব্যাপারে একটু সাবধান হওয়াই ভাল। ফলে যতিদিদির নাকে ক্রন্দন, "শীঁতলবাঁবুর যঁতঁ অঁশুটোঁনো কঁথা"। ঐ বিশেষণটির অর্থ আবিষ্কার করতে পারিনি।

যতিদিদিকে একদিন বাড়ি থেকে বিদায় করে দেওয়া হল—অপরাধটা কি, কখনও জানতে পারিনি। সামান্য কটা বাসন, দু-চারখানা থানকাপড় আর সেই 'যতিবালা' লেখা পানের বাটাটা নিয়ে বড়হিস্যার বাড়িতে চল্লিশ বছরের বাস চুকিয়ে সে এরুয়ালি থানার গয়েশপুর গ্রামে ফিরে গেল। একগাছা সোনার চুড়ি আমার হাতে দিয়ে বলল, "তোমার বউকে দিও।" যতদিনে সেই চুড়ির উত্তরাধিকারিণী এলেন, ততদিনে জিনিসটা কোথায় হারিয়ে গেছে। সাধু-সন্নিসি দেখলেই যতিদিদি জিগেস করত, "বাবা, মুক্তি কি হবে? কবে হবে?" ক'বছর পরে খবর এল এক মহাষ্টমীর দিনে যতিদিদির মুক্তি হয়েছে।

শৈশবের ঘনিষ্ঠ পরিচিত আর একটি মানুষ বসন্ত শঙ্খবণিক ওরফে বরিশাল-বিখ্যাত খর্বকায় বসা। তার উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট। বয়স জিগেস করলে বসা বলত, "তিরাশি সনের বইন্যা কতদিন হইলে?" হিসেব করে বলতাম, "পঞ্চাশ বছর।" "দিল্লির দরবার?" [বলা প্রয়োজন, লেখকের ঠাকুর্দার সঙ্গে বসা উক্ত দরবারে গিয়েছিল। এই ঘটনা তার আকাশচুম্বী পদাভিমানের অন্যতর কারণ।] "পঁচিশ বছর।" "তোমার ঠাকুমা মারা গ্যালে কত বছর হইল?" "তিরিশ বছর।" "এহন যোগ কর।" "বসা, যোগ করলে ত' একশ পাঁচ হয়।" একটু চিন্তা করে বসা বলত, "অত হইবে না, তবে যাইট ছাড়াইছে।" তিরাশি সনের বন্যায় ডেঙা নিয়ে বইঠা বাওয়ার কথা বসার স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল। তবে ওর কল্পনাশক্তিও কম ছিল না। ঐ বন্যাতে এক নাতিদীর্ঘ তিমি মাছ কীর্তনখোলা নদীতে ভেসে বরিশাল শহরে পৌছায়, তার কঙ্কালটা শহরের বার লাইব্রেরিতে রাখা ছিল। বসা সেই তিমির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় দাবী করত। অসম্ভব দাবী, কারণ বসার নিজ গ্রাম পিরোজপুর বরিশাল শহর থেকে অনেক দূরে। ক্ষুদ্রকায় বসা পুলিশী ধাঁচে ছাঁটা খাকি হাফপ্যাণ্ট-হাফসার্ট পরে ঘুরে বেড়াত এবং থানার পুলিশদের সঙ্গে তার খুবই দহরম-মহরম ছিল। বোতাম-আঁটা বুক-পকেটে একটা ছোট নোটবই থাকত। কি ব্যাপার জিগেস করলে গলা নামিয়ে বলত, "কইও না কারওরে। আমি সি ঐটির [অর্থাৎ C.I.D.] লোক। কোথায় কি হয় সব টোক রাখতে আছি।" ঐ নোটবইটি বোঝা গেল যাবতীয় 'টোকের' আধার। এ ব্যাপারে একটু অসুবিধে ছিল, কারণ বসার কখনও অক্ষরজ্ঞান হয়নি। যা হোক, টোক-রক্ষাকারী হিসেবে স্থানীয় পান-সিগারেটের দোকান থেকে ও তোলা দাবী করত। দোকানিরা ওকে সম্পূর্ণ নিরাশ করত না।

বসার বিলাসব্যসনের দিকে বেশ ঝোঁক ছিল। বাজারে গিয়ে মাঝে মাঝে সে অল্প পরিমাণে ধান্যেশ্বরী টেনে আসত, বেশী সহ্য হত না। আর ঠাকুর্দার Drinks Cabinet -এ যে সব বিদেশী পানীয় ওঁর মৃত্যুর পর অব্যবহৃত পড়ে ছিল, সুযোগ-সুবিধে পেলে তার থেকে দু-এক চুমুক ও সেবন করত। সেদিন সগর্বে আমাদের কাছে ঘোষণা করত, "আইজ বিলৈতি", অর্থাৎ সে আজ বিলিতি পানীয় খেয়েছে এবং ফলে তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশের বর্তমান সামাজিক সংস্কৃতিতে স্কচ হুইস্কি-পুজার যে ঐতিহ্য তা কি বসাই প্রথম স্থাপন করে ?

মদের সঙ্গে অন্য যে বিলাসটি সাধারণত উল্লেখ করা হয়, তার প্রতিও বসা সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ছিল না। মাঝে মাঝে ডাক পিয়নের হাতে বসার প্রণয়িনীদের [প্রণয়টা অবশ্যই নগদ মূল্যে কেনা] চিঠি আসত। ওর অক্ষরজ্ঞান না থাকায় সে চিঠিগুলি আমাকে পড়ে শোনাতে হত। গভীর অনুরাগে ভরা একটা চিঠি বিশেষ করে মনে পড়ে : "প্রিয়বর, আশা করি তোমার স্মরণ আছে যে ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে জেলের ভাত খাওয়াইতে পারি।"

শৈশবে বসা সখের যাত্রায় অভিনয় করত। আকারে না বাড়ায় অনেক বয়স অবধি ও বালগোপাল, বামন অবতার, বালখিল্য মুনি ইত্যাদি বিশিষ্ট ভূমিকায় নামতে পারত। যাত্রা মারফত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ভারত-সংস্কৃতির থান থান কেতাবাদির সঙ্গে ওর পরোক্ষ হলেও গভীর পরিচয় ছিল। তবে মাঝে মাঝে, সম্ভবত বিলৈতির প্রভাবে, সেই জ্ঞান একটু এলোমেলো হয়ে যেত। কটক জিলাবাসী নগা ওরফে নগেন্দ্র পরিডাকে বিচার-সভায় ন্যায়ের পণ্ডিতের মত বসা প্রশ্ন করত, "ক' দেহি, রাজসূয় যজ্ঞের সময় ভীম লক্ষ্মণেরে কি কইছিলে ?" তারপর বিস্ময়াহত নগেন্দ্রকে উত্তরের সুযোগ না দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে তর্জনী আস্ফালন করে জবাবটা নিজেই দিয়ে দিত : "কইছিলে, এই সভায় তুমি প্রবেশ করতে পারবা না।" বিস্ময় কাটিয়ে উঠে নগা প্রতিপ্রশ্ন করত, "পাণ্ডবের-অ সভায় লক্ষ্মণ-অ ক্যামনে আইলা ?" এইবার বসা নিউটন-যোগ্য বিনয়ে বলত, "হেয়া আমি ক্যামনে কমু ? আমি কি সর্বাগ্য [অর্থাৎ সর্বজ্ঞ] ?" এর পর আর তর্ক চলে না।

নগার রাজনৈতিক চেতনা ছিল গভীর। ওর কাছেই প্রথম শুনি যে মহাত্মা গান্ধী কল্কি অবতার। হাঁটু অবধি ধুতিটা ওঁর ছদ্মবেশ। রোজ রাত্রে উনি একশ অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে জ্যাকের মত একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কুচ-কাওয়াজ করেন। শুভ মুহূর্ত এলে সেই বাহিনী নিয়ে নর্মদা তীরে উনি গোরাদের কচুকাটা করবেন। তারপর সোনার সিংহাসনে খাটো ধুতি ছেড়ে জড়ির পোশাক পরে বসবেন। রামরাজ্য স্থাপন হবে। বীর হনুমান আপাতত প্রচ্ছন্ন আছেন, যথা সময়ে রাজমন্ত্রী-তথা-সেনাপতি রূপে দেখা দেবেন। নগার ভবিষ্যদ্বাণী অংশত ফলেছে সন্দেহ নাই। শুধু মহাবীরের সেনাপতি রূপটা প্রতিবেশী রাজ্যেই বেশী প্রকট হয়েছে। গান্ধীহত্যার পর বরিশালের রাস্তায় নগার সঙ্গে দেখা হয়— তখন ও বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করার 'স্বাধীন ব্যবসা' ধরেছে। ওর আকুল কান্নাটা কখনও ভুলতে পারব না। "দেবতারে হত্যা করিলা। বসুন্ধরা পাপে ডুবিলা। কলি শেষ-অ হইলা, তপু বাবু। এখন মহাপ্লাবন-অ হইবে।"

পাচক সদ্‌ব্রাহ্মণ ধর্মানন্দ দাসেরও পিতৃভূমি উড়িষ্যা। তার পুঁথিগত বিদ্যা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সে তার জন্মস্থানকে কলিঙ্গ বলে বর্ণনা করত। রাজা অশোকের সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধের ব্যাপারটা ও জানত। অবিশ্যি ওর মতে মামুলি ইতিহাসে এ বিষয়ে যা পাওয়া যায় সেটা ভুল। আসলে কলিঙ্গরাজ দেবানাম প্রিয় অশোককে হারিয়ে ভূত করেন। কথাটা

নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কারণ ধর্মানন্দর পূর্বপুরুষ ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। মনে হত ঐ যুদ্ধজয়ের ব্যাপারটা তিনি নিজেই ধর্মানন্দকে জানিয়েছিলেন। বর্ণ ধর্ম সম্পর্কে আমার প্রাথমিক জ্ঞান ধর্মদাসেরই শিক্ষায় (পরে ফরাসী সাহেব লুই দুমঁর যুগান্তকারী লেখা পড়ে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়, বুঝি যে ওটা শুচিবায়ুরই নামান্তর)। সুতরাং অর্জুনের মত দ্রোণাচার্যকে তারই দেওয়া অস্ত্র ছুঁড়ে মারতাম। বামুনরা আবার কবে লড়াই করত? চাল-কলা খেয়ে ঢাল তলোয়ার ধরা যায়? অবজ্ঞার সঙ্গে ধর্ম জানাত— ওরা আদৌ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ছিল। [পরে জানি বল্লাল সেনেরও একই জাত। আগে ভাবতাম লোকটা বদ্যি-বামুন।] তা ছাড়া দ্রোণাচার্যের ব্যাপারটাও মনে করিয়ে দিত। জাতিভেদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরও বাড়লে আমি ধর্মের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ করি। 'দাস' কখনও বামুন হয়? ভুরু কপালে তুলে ধর্ম বলত,— শূদ্রভূমি বঙ্গালদেশে হয় না ঠিকই, তবে জগন্নাথের খাস জমিদারিতে অবশ্যই হয়। প্রভু ত' আর অন্য জাতের সেবা নেন না সোজাসুজি, উড়িষ্যার বামুনরাই ওঁর খাস ভৃত্য, তাই তাদের পদবি দাস। আমাদের চেয়ে ও যে উঁচু জাতের মানুষ এ কথাটা সর্বদাই মনে করিয়ে দিত। গৌড়-বঙ্গে ব্রাহ্মণেতর সব জাতই শূদ্র, রঘুনন্দন-ঘোষিত এই তত্ত্ব ধর্ম ঠাকুরের মতের সঙ্গে হুবহু মিলে যেত। আমাদের যে লোকে বদ্যির বামুন বলত, সেটা একেবারেই না কি বাজে কথা। প্রমাণ, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ধর্মানন্দ আহারে বসলে আমার মত নিম্ন জাতির লোক যদি তাঁকে স্পর্শ করে ত' খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়া ছাড়া তাঁর কিছু করার থাকে না। ছুটির দিনে ধর্ম খেতে বসলে মাঝে মাঝেই এ ব্যাপারটা পরখ করে দেখতাম, ফলে ওর দ্বিপ্রাহরিক আহারটা প্রায়ই শেষ হত না। পরে মা একদিন জানতে পারলে প্রচণ্ড ঠ্যাঙানি খাই। নৃতত্ত্বের practicals অকালে বন্ধ হয়ে গেল।

বরিশালে উড়িষ্যাবাসীদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। তারা শহরে উড়িষ্যা থেকে যাত্রা আনাত। ধর্ম এবং নগার আনুকূল্যে কয়েকবার ওড়িয়া যাত্রা দেখার সুযোগ হয়। সে যাত্রায় সূত্রধর গোছের একজন লোক থাকত। নাটকের চরিত্ররা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলে সে 'ডিরেকশান' দিত : "রাম-অ আউচি, সীতা আউচি, এবে নাচ-অ কুরু, নাচ-অ কুরু।" তখন রাম-সীতা নেচে নেচে অভিনয় করতেন। কতকগুলি দৃশ্য বড়ই প্রাণস্পর্শী ছিল। রাবণ সোলার দশমুণ্ড লাগিয়ে রাজসভা আলো করে বসেছেন। হঠাৎ সভামধ্যে হনুমান হুপ করে লাফিয়ে পড়লেন। ক্রোধে কম্পমান রক্ষরাজ উঠে দাঁড়ালেন। এক পা সামনে বাড়িয়ে তর্জনী তুলে গর্জন করলেন, 'পড়া' অর্থাৎ পালা, তারপর দক্ষিণে বামে ঘুরে ঘুরে বজ্রনির্ঘোষে সেই আদেশের পুনরাবৃত্তি, "পড়া, পড়া।" হনুমান তখনও অচল। তখন রাবণের বীররসময় সঙ্গীত, "পড়া রে হনূমান-অ পড়া।" এবং তৎসহ তাণ্ডব। পরবর্তী দৃশ্যে বিভীষণ-নন্দন রক্ষপতির সভায় গান গেয়ে আবেদন করতেন, "আজি তুত-অ [তোমার] সনে যুদ্ধে-এ-এ যাইব রে জ্যেষ্ঠ-অ তাত-অ।" তারপর জ্যাঠা-ভাইপোর যৌথ নৃত্য। এ জাতীয় নাচ কোনও বাঙালী পরিবারে চালু দেখিনি। ফলে ব্যাপারটা একটু অসঙ্গত মনে হত। জ্যাঠা ছাড়া আর

নাচানাচির লোক পেল না ছোঁড়া ?

গণ-মানস বিষয়ে এই উপ-পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে আরেকটি লোকের কথা লিখি। স্টীমার ঘাটের সেই কুলিটির কাছে অপ্রত্যক্ষভাবে ভূয়োদর্শনের একটি অত্যন্ত উঁচুদরের পাঠ নাই। জাহাজ ঘাটে পৌঁছলেই তাকে দেখা যেত। তারপর মাল মাথায় নিয়ে একটি ঘ্যান ঘ্যান ধ্বনি তুলে সে এগুত : "আমারে কেউ ভাল মাল দেলে না।" ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার এই চিরন্তন অভিযোগ নানা মানুষের আত্মবিলাপে প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি। নিজেও মন্ত্রপাঠের মত অনুক্ষণ আবৃত্তি করি, "আমারে কেউ ভাল মাল দেলে না।" কি করা যাবে বলুন, ভাল মাল কেউ কাউকে দেয় না কখনও। ভাগ্যদেবতার দয়ায় যে লোকটা ভাল মাল পেয়েছে বলে ঈর্ষীত হচ্ছেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, অগ্নিমান্দ্যে তার ঘুম হয় না, ছেঁড়া কাঁথায় সুখসুপ্ত গৃহভৃত্যকে সে ঈর্ষার চোখে দেখে। তবে ঘ্যানঘ্যান করায় উপকার আছে, ক্ষোভটা চাপা না থেকে প্রকাশ পায়, catharsis বা sublimation এর কাজ হয়। সুতরাং ইচ্ছে হলেই ঘ্যানঘ্যান করবেন, কারও কথা শুনবেন না। দেখবেন—বাড়িতে ভীড় কমে যাবে। প্রাণেও শান্তি পাবেন। তবে ভাল মাল পাওয়ার আশা ছেড়ে দিন। ও বস্তু পাওয়া যায় না। বাজারেই ওঠে না।

আমরা কৈশোরে পৌঁছবার আগেই দেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। যখন বছর বার-তের বয়স তখন জানলাম যে নবাবজাদা, কীর্তিপাশার মেরধারা, আফছারিয়া, মেনাজদ্দি এঁরা হলেন এক 'নেশন', আর নগা, বসা, ধর্ম, নায়েব মশায়, পণ্ডিত মশায়, আমি, দাদা এরা হলাম আরেকটা 'নেশন'। হিন্দু-মুসলমান যে দুই জাত, গোঁড়া বামুনরা মুসলমানদের ছোঁয়া খায় না— সে কথা অবিশ্যি জানতাম। তবে বিটলেগুলি আমাদের ঘরেও ত' খায় না। অপরপক্ষে আফছারিয়ার ছোঁয়া না খেলে লোকসান আফছারের না, আমাদেরই হবে এ জ্ঞানও ত' টনটনেই ছিল। সুতরাং পুরুতঠাকুর আর নগা কেন এক নেশন, আর নবাবজাদা এবং মেনা কেন অন্য নেশন বুঝতে কিছুদিন সময় লাগে।

সময় লাগার একটা কারণ এই যে, আজন্ম একটি পরিবারকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে জানতাম। চরামদ্দির জমিদার ইসমাইল খান চৌধুরীকে আমরা দাদু সাহেব ডাকতাম, তাঁর স্ত্রীকে দাদী। বাবা ওঁদের যথাক্রমে জ্যাঠাসাহেব এবং জ্যেঠিমা ডাকতেন, বেগম সাহেবা আমার মাকে ডাকতেন 'বৌ'। ওঁর ভাই নবাব ফরক্কির ঘটকালিতেই আমার মা-বাবার বিয়ে হয়। চরামদ্দির জমিদারদের নবাবী ঢঙের গম্বুজওয়ালা বাড়িটা আরব্যোপন্যাসের কাহিনীর অন্যতম পটভূমি বলে কল্পনা করতাম। আলিবাবা-কাহিনীর চল্লিশ দস্যুর যে ঐ বাড়ির গুদামেই তেলের জালায় এন্তেকাল হয়, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। ইসমাইল চৌধুরীর বড় ছেলে সাজাহান এবং ভাইপো মাণিক,— আমাদের যথাক্রমে সাজু কাকা এবং মাণিক কাকা,— বয়সে কিছু বড় হলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা না কি অনেক পুরুষের। শুনেছি— ইসমাইল চৌধুরীর বাবার নামে খুনের দায়ে হুলিয়া বের হয়। প্রসন্ন সেন

তাঁকে বড়হিস্যার বাড়ির অন্দর মহলে আশ্রয় দেন। সেখানে তিনি বেশ ক' মাস শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে লুকিয়ে থাকেন। ঐ বাড়ির সঙ্গে ছোটবেলার অনেক সুখস্মৃতি জড়িত। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতেই খাঁটি মোগলাই খানার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। ও বাড়ি থেকে দাওয়াত আসার প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানের ছোঁওয়া খায় না এমন অবিশ্বাস্য কথা আমাদের অভিজ্ঞতার অঙ্গ ছিল না।

সমন্বয়বাদ বা syncretism-এর আরও সজীব সব প্রমাণ আমাদের চার পাশে ছিল। বিচিত্র বর্ণের কাঁথার টুকরো লাগান আলখাল্লা গায়ে, চাঁদ-তারা এবং ত্রিশূল মেলান ফলাওয়ালা 'আশা' অর্থাৎ বিশিষ্ট চেহারার লোহার ডাণ্ডা হাতে মুশকিল-আসানের পীর আসতেন। নিতান্ত সঙ্গতিহীন ভাবে প্রথমে গাজীর নাম নিয়ে তিনি লক্ষ্মী ঠাকরুণের নানা ইচ্ছা অর্থাৎ গার্হস্থ্য ধর্মের মূল কথাগুলি প্রচার করতেন :

"যেই নারী স্নানের পর মুখে দ্যায় পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমারই সমান।
সতী নারীর পতি যেন পর্বতের চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নায়ের কুড়া ॥
সারা দিন মাইঝ্‌ঝা বউর গালে থাকে চাবা [পান]।
মাইঝ্‌ঝা কর্তা বাড়ি আইলে হ্যারে ডাকে বাবা ॥'

"হগলের [সকলের] মুশকিল আসান কর, গাজী" বলে এই সুসমাচার শেষ হত।

কিন্তু আকাশে যে মেঘ ঘনাচ্ছে তার আভাস নানা সূত্রেই পাওয়া যাচ্ছিল। গল্প শুনতাম,— খিলাফত আন্দোলনের অন্যতম নায়ক, দেওবন্দ থেকে পাশ করা আলিম, স্থানীয় এক মৌলবী সাহেব দেশ তথা খলিফাভক্তির দায়ে দীর্ঘদিন জেল খেটে কারামুক্ত হওয়ার পর রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে বরিশালের টাউন হলে সাম্প্রদায়িক প্রীতি প্রচার করে এক বক্তৃতা করলেন : "উফারে নীল আসমান, নীচে সবুজ ঘাস, ইয়ার নীচে [অর্থাৎ আসমান এবং ঘাস উভয়েরই নীচে] হিন্দু-মোছলমান দুই ভাই। দোনোতে কোনও ফারাক নাই, দোনোতে কোনও কাজিয়া নাই। হারামজাদা ফিরিঙ্গী আইয়া দোনোর ভিতর ফাসাদ বাধাইছে। ভাই সকল, শয়তানের ফান্দে পা দিয়া আখের খুয়াইবেন না, আল্লার এই না-লায়েক বান্দার এই আরজি।" "রাম-রহিম না জুদা কর ভাই" গান দিয়ে সভা শেষ হল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মৌলবী সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে তাঁর পাদুকাজোড়া আর খুঁজে পান না। তখন তাঁর উত্তেজিত স্বগতোক্তি : "জোতাজোড়া কই গ্যালে ? লালা লাজপত রায় আইলেন, লালা মহাত্মা গান্ধী আইলেন, লালা দেশবন্ধু আইলেন— ক্যারও ত জোতা হারাইলে না। হুধা [শুধু] আমারই জোতা হারাইলে ক্যান ? লইলে কেডা, লইলে কেডা ? হেঁদু হালায়ই নেছে।"

মেঘ যে আরও ঘন হয়েছে সে কথা বুঝলাম যখন সবাই বলতে লাগল যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী আমাদের সর্বজনপ্রিয় হক সাহেব, অর্থাৎ শের-ই-বাংলা ফজলুল হক শত্রু পক্ষের লোক। বরিশালের স্টিমার ঘাটে নেমে,

জনসংযোগের উদ্দেশ্য নিয়েই বোধ হয়, উনি পায়ে হেঁটে অনেক দূর অবধি যেতেন। অনেক সময়ই পথে আমাদের বাড়িতে থেমে কিছুক্ষণ গল্প করতেন। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বের হবার পর ওঁর অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রামখানা অনেকদিন পর্যন্ত বাড়িতে রাখা ছিল। তিন শব্দের তারবার্তা "Barisal Ki Jai". ওঁর বিশাল বপু সাধারণ চেয়ারে ভাল আঁটত না। তাই উনি বাড়ি এলে জাঁদরেল সাইজের একটি চেয়ারে ওঁকে বসতে দেওয়া হত। বরিশালের আর পাঁচজন ভদ্রলোকের মত উনিও স্পষ্ট বরিশালীতে কথা বলতেন, ভিক্টোরিয় ন্যাকামির ধার ধারতেন না। রাজনীতির খাতিরে উনি একাধিকবার দল বা জোট বদল করেছেন। যে ঘটনার কথা লিখতে যাচ্ছি সে ঘটনার সময় উনি মুসলিম লীগের পক্ষে। কৃষক প্রজা দলের ছাত্ররা স্টিমার ঘাটে কালো নিশান নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। প্রতিবাদ যে শুধু শিক্ষিত লোকের নয়, জনগণ অর্থাৎ কৃষক-মজুরদেরও বটে, সে কথা বোঝাবার জন্য কিছু গরিব মানুষও জড় করা হয়েছে,— কুলোকে বলছে মাথা পিছু দু'আনা দরে (তখনও বরিশালে ঐ পয়সা দিয়ে দু'সের দুধ বা একটা ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, সুতরাং দরটা নেহাত কম না)। গণ-সমর্থকদের শেখান হয়েছে, হকসাহেব স্টিমারের সিঁড়ি বেয়ে নামলেই তারা নিশান আস্ফালন করে "shame! shame!" বলে ধিক্কার দেবে। কিন্তু ব্যাপারটা একটু গোলমাল হয়ে গেল। ঐ বাঘের মত মানুষটিকে সামনে দেখে নিশানবাহীরা পালাবার পথ পায় না। ছাত্রনেতারা উস্কাচ্ছেন, "চুপ করিয়া ক্যান ? ক', চ্যাঁচাইয়া চ্যাঁচাইয়া ক'।" অতি সঙ্কোচে মুখ হাতে ঢেকে বিক্ষোভকারীরা শ্রীরাধিকার মত নরম সুরে বলল, "শ্যাম ! শ্যাম !" হক সাহেব মুচকি হেসে এগুলেন। পরবর্তী স্টপ আমাদের বাড়ি। সেখানে ওঁর বাল্যবন্ধু ইন্দুভূষণ গুপ্ত বসে আছেন সদলে : "আইজ আউক ! ফজলুরে আইজ ধোয়ামু"— অর্থাৎ সস্নেহ গালিগালাজের তোড়ে শের-ই-বাংলাকে উনি ধৌত করে ছাড়বেন। হক সাহেব ধীরে সুস্থে পাপোষে পা মুছে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকলেন। ঢোকামাত্র ইন্দুবাবুর আক্রমণ : "ফজলু, তর লইগ্‌গা ভদ্দরসমাজে আর মুখ দ্যাহান্ যায় না।" হক সাহেব গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে বাল্যবন্ধুকে দেখলেন একটুক্ষণ। তারপর বললেন, "হেইলে ত তর বড় মুশকিল ! ভদ্দরসমাজে মুখ দ্যাহাইতে পারিস না ? তয় হোগাটা দেহাইস।" এই ঋষি বাক্যের পশ্চিমবঙ্গানুবাদ আর দিলাম না।

এ সব ব্যাপারেও ঘাবড়াতাম না, কিন্তু পালা বদলের রিহার্সাল ক্রমে ঘরের দাওয়ায় এসে পৌঁছাল। হঠাৎ দেখলাম আফছার গ্রাম থেকে ফিরল বেশ ভব্যিযুক্ত কাঁচাপাকা দাড়ি নিয়ে। এর আগে পর্যন্ত ওর ধর্মজীবন সেই বিখ্যাত ডাকাতের আদর্শে গড়ে উঠেছিল, যে ফাঁসীর আগে নমাজ পড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত আর শুভ কাজটি করেনি। কারণ তার অন্তকালের উপদেষ্টা মোল্লা সাহেবকে সে প্রশ্ন করে, নমাজ না পড়লে কি হবে। তাঁর উত্তর, দোজ্‌খ্ যেতে হবে। তারপর ডাকুপ্রবর প্রশ্ন করলেন, "গহরজান বিবি কাঁহা যায়গী ?" মোল্লা দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে 'তওবা, তওবা' করে উত্তর দেন, "জাহান্নাম, জাহান্নাম।" শুনে ফাঁসীর আসামী "সালাম মোল্লা সাহাব, নমাজ আপ পড়িয়ে" বলে দড়িতে ঝুলে পড়ল। গহরজানবিহীন বেহেস্তের প্রতি সে কোনও আকর্ষণ বোধ

করেনি। আফছারকে প্রাক্-দাড়ি যুগে যদি কখনও জিগেস করতাম, "অ আফছার, তুই নমাজ পড়িস না, রোজা রাখিস না ?" আফছার বলত, "হুজুর, এত গুণাহ্ করছি। নমাজ পড়িয়া কি ওয়া কাটাইতে পারমু ? আল্লার রহমত হইলে এমনেই হইবে।" একেবারে মরমিয়া সূফীর কথা ! এবার দেখছি সে পাঁচ-ওয়াক্ত্ নমাজ পড়ছে। রমজানে সারাদিন নিরম্বু উপবাস। ভাবলাম, ওর এতদিনে ধর্মে মতি হয়েছে, কৃত গুণাহর জন্য অনুতাপে ওর হৃদয় দগ্ধ, লীলা মজুমদারের ভাষায় 'ড্যাও দুদু চেটে' খাচ্ছে। ওর এই চারিত্রিক উন্নতির প্রশংসা করায় গলা নামিয়ে আফছার একদিন বলল, "কথা হেয়া না। কওমের হগলে [সকলে] কইতে আছে, দু'দিন বাদে পাকিস্তান হইবে। বুত-পরস্তের [পৌত্তলিক] ঘরে কাম করি। দিন-এর নিয়ম-কানুন মানিয়া না চললে, হ্যাসে যামু কই ?' মনে বড় আঘাত লাগল। বললাম, "অ আফছার ! বুত তুই আমাগো ঘরে দ্যাখলি কোন্হানে ? এক ছোট বুইনের পুথুলগুলা আছে। হেয়া কি আমরা পূজা করি ?" আফছার লজ্জিত হয়ে বলল, "না হুজুর, হেয়া কথা না। বইরশালে বইয়া [বসে] আপনারা বুতপরস্তি করেন এইয়া কি মুই কইছি ? কিন্তু কীর্তিপাশায় দুর্গাদালানে বছর বছর যে পিরতিমা আয় [আসে], হেইয়ারে আমরা কই বুত। আর ঐ যে সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির ...।" আফছারের শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতায় বুঝলাম— আর বেশী সময় বাকী নেই।

ইসমাইল চৌধুরী সাহেবের বড় ছেলে সাজ্জাদ, আমাদের সাজুকাকা, কৈশোর থেকেই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি। ও পথে তাঁর প্রথম হাতে খড়ি RSP বা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য হিসাবে। ওঁর পাঠকক্ষেই প্রথম কার্ল মার্কস এবং মার্কসবাদী মনীষীদের লেখার সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯৪০ সনে হঠাৎ একদিন মুসলিম লীগের বিশাল ঝাণ্ডা কাঁধে ওঁকে শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করতে দেখা গেল। জিগেস করলাম, "এডা কি হইল ?" উত্তর দিলেন, "কাকু, অনেক ভাইব্বা দ্যাখলাম, আমাগো আর অন্য পথ নাই।" এক রোখা মানুষটি ঐ পথেই বাকী জীবন কাটান। '৪৬-এর দাঙ্গায় উনি অংশ নিয়েছেন গুজব রটল। কথাটার সত্যতা পরীক্ষা করার উৎসাহ পাইনি কখনও। যাই ঘটুক, একান্ত প্রিয়জন প্রিয়জনই থাকে, এই মর্মান্তিক সত্যিটা সমাজ জীবনের বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি হল। গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলিকে এড়িয়ে যায়। এটা মানুষের সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য জানি না। দাঙ্গা থামলে বিজয়ার পর যথারীতি সাজুকাকা আমার মা-বাবাকে প্রণাম করতে এলেন। বালিকাবধূ হয়ে মা যখন শ্বশুরবাড়ি আসেন সাজুকাকার বয়স তখন দুই বছর। দেবশিশুর মত রূপবান ক্ষুদ্র দেবরটিকে উনি বিশেষ স্নেহ করতেন। ওঁর প্রণাম নিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "সাজু, পূজার পর হিন্দুর বাড়ি প্রণাম করতে আইলা ?" শক্ত সমর্থ পুরুষটি হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন, "বউদি, আপনে মায়ের চাইয়াও বেশী। বরাবর আহ্লাদ দিয়া মাথা খাইছেন। ভাল করি মন্দ করি আপনে কিছু কইবেন না। আপনাগো বাড়ির দরজা বন্ধ হইলে আমি যামু কই ?"

আদর্শবাদ জিনিষটাকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ সে কাকে কোন পথে নিয়ে যাবে তার কোনও বাঁধা নিয়ম নেই। ১৯৭১-এর মুক্তি যুদ্ধে

সাজুকাকা মারা গেছেন খবর পেলাম। শেষ অবধি উনি পাকিস্থান সরকারের পক্ষেই ছিলেন। আবেগপ্রবণ মানুষটি তাঁর আদর্শ পুনর্বিচার করা প্রয়োজন মনে করেননি। ১৯৭৪-এ বরিশাল গেলাম, একটা উদ্দেশ্য সাজুকাকার মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা। কারণ ঢাকায় কেউ কিছু বলতে পারলেন না। গিয়ে দেখলাম চরামদ্দির জমিদার ভবন এখন সরকারী দফতর। একটু নীচু গলায় সাজহান চৌধুরীর খবর কেউ জানে কি না জিগেস করায় সবাই ত্রস্ত হয়ে কথা বদলাল। একটি লোক এগিয়ে এসে বলল, "বাইরে চলেন।" তাঁর কাছে শুনলাম একদল পাকিস্তানী ফৌজ বরিশাল থেকে স্টিমারে সমুদ্রের দিকে এগুচ্ছিল। সেই জাহাজে অল্প কয়েকজন বেসামরিক যাত্রী ছিলেন—তাঁদের মধ্যে এই ভদ্রলোক আর সাজুকাকা দুইজন। জঙ্গী প্লেন থেকে বোমা পড়ে জাহাজটি ডুবে যায়। সাজুকাকা আহত হন। ওঁরা দু'জন সাঁতার কেটে পাড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রক্তক্ষয়ে অবসন্ন সাজাহান চৌধুরী বরিশালের নদীতে ডুবে গেলেন।

যে মানুষটির মৃত্যুকাহিনী শুনলাম সব হিসাবেই ত' তিনি শত্রু। মানুষের রাজনৈতিক জীবনে যা কিছু মঙ্গলময় মনে করি তার বিরুদ্ধে লড়াই করে সাজুকাকা আক্ষরিক অর্থেই প্রাণ দিলেন। তবে এই শত্রুনাশের বিবরণ শুনে তীব্র যন্ত্রণা বোধ হল কেন ?

AMARBOI.COM

ক্রান্তিকাল

'৪১ সনে বইরশাল শহর ছেড়ে বিদ্যালাভার্থে স্কটিশচার্চ কলেজের ডাফ হস্টেলে গিয়ে উঠি। দু' বছর পর কলেজ বদলে প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলেও কলকাতায় গুরুকুলবাসের সাত বছর এই খ্রীস্টিয় হস্টেলেই কাটে। সজনী দাস মহাশয় এক সময় ঐ হস্টেলে ছিলেন। ওঁর আত্মকথায় লিখেছেন— ওঁদের ছাত্রাবস্থায় হিন্দু ছেলেরা বিনা পয়সায় ডাফ হস্টেলে থাকতে পারত, আহার-বিহারের ব্যাপারে কুসংস্কার কাটিয়ে উঠলে তারা অচিরে একদিন যীশুর আশ্রয় নেবে সম্ভবত এই ভরসায়। আমাদের যুগে এই সুব্যবস্থা রদ হয়ে গিয়েছিল। শুধু স্কটিশ ছাড়া অন্য কলেজের অ-খ্রীস্টান ছাত্ররাও ওখানে থাকতে পারত। মানিকতলা বাজারের কাছে, বিডন স্ট্রিটের উপর এই হস্টেল সত্যিতেই "কসমোপলিটান" ছিল। 'নানা দিগ্‌দেশাদাগত্য নানাবিধঃ পক্ষিণঃ' ঐ হস্টেলরূপী মহাদ্রুমে ক্ষণকালের জন্য বাসা বাঁধত। তাদের কারও কারও ধরনধারণ হাঁটাচলা দেখে আমাদের মতো মফস্বলবাসী গাঁইয়াদের চোখ ট্যারা হয়ে যেত।

যাঁরা ওখানে থেকে এম. এ, ল' পড়তেন তাঁদের ভেতর কেউ কেউ 'শেষের কবিতা' এবং প্রমথেশ বড়ুয়া এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রভাবের টানাপোড়েনে ঢুলু ঢুলু চোখে ট্যাঁশগরুর জীবন যাপন করতেন। মানে, ওঁদের স্বাভাবিক বিচরণস্থল বন্ধনহীন মুক্তাকাশে পুচ্ছ তুলে নাচা ত' ঠিক হয়ে উঠত না, দ্বারভাঙা-আশুতোষ বিল্ডিংয়ের কঠিন জমিতে নীরস বিদ্যের শুকনো ঘাস চিবিয়েই বেলা বহে যেত। 'সে কি আর ভাল লাগে ?' দুঃখ লাঘব বা প্রকট করার জন্য বড়ুয়া-প্যাটার্ন পাঞ্জাবি পরে, চুল একটু সযত্নে উসকো-খুসকো করে এঁরা ঘুরে বেড়াতেন। কোনও প্রশ্নের সোজা উত্তর দিতেন না। যদি কেউ জিগেস করত, "কোথায় চললেন ?" অবিন্যস্ত চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে উত্তর হত, "এ প্রশ্নের কি সঠিক জবাব আছে কোনও ? রাসবিহারী এভিন্যুও হতে পারে, আবার রাশিয়াও হতে পারে।" কারও হাতে, সযত্নে তর্জনী এবং অনামিকার মাঝখানে আলগোছে ধরা ফ্রয়েড বা এলিসের মনস্তত্ত্ববিষয়ক রচনা। আর যাঁদের স্টাইলের সাধনা আরও উচ্চস্তরে উঠেছে তাঁদের বগলে এলিয়টের কবিতা বা মাতিসের ছবির বই। সমকালীন আঁতেলগণ, তোমরা যদি ভেবে থাক যে আঁতলামি তোমাদের আবিষ্কার ত' নিতান্ত ভুল করছ। ও

জিনিস কলকাতা শহরে ১৮১৬/১৭ সনেই শুরু হয়েছে। আমাদের পাশ্চাত্যায়নের প্রধান লক্ষণই পশ্চাত-পক্কতা। স্যাডলার কমিশন ১৯১৭-য় বাঙালি ছোঁড়াদের বুকনির ঠ্যালায় ভিরমি খেয়ে লিখেছেন, এদের তুল্য আঁতেল জগতে নাস্তি। তবে এখনকার আঁতলামির অপরিহার্য অনুষঙ্গ হুইস্কি (বা আরও উঁচুতে উঠলে কালী মার্কা) চল্লিশের দশকে তত চালু ছিল না। সে যুগের মোল্লাদের দৌড় ছিল সাধারণত সেন্ট্রাল এভিন্যুর কফি হাউসের দেওয়ান-ই-খাস বা লর্ডস উইং পর্যন্ত— যে দিকটায় চার আনার কফি ছ' আনায় বিক্রি হত। যাদের পকেটে পয়সা ছিল তারা 'আবদাল্লা' বা 555-এর টিন হাতে করে ঘুরে বেড়াত। হাতে 999 থাকলে বুঝতে হত ক্যাবলার নতুন পয়সা হয়েছে।

ছাত্রমহলে ব্যর্থ প্রেমিকদের বিশেষ সম্মান ছিল। আন্টার্টিক অভিযানে পরাজিত নায়ক স্কটকে ইংরেজরা এবং রক্ষরাজ রাবণকে তামিল জাতীয়তাবাদীরা যে চোখে দেখে, সেকালের দেবদাসদের আমরা সেই চোখে দেখতাম। পরাজয়ই তাদের গৌরবের জয়টিকা। হেসো না বাবাসকল। তখন সহপাঠিনীদের 'আপনি' বলার রেওয়াজ ছিল, অবশ্যি কথা বলার সুযোগ কখনও হলে, তবেই। আজকাল যে সবাই সাঁওতালী আদর্শে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে পরস্পরকে তুই-তোকারি করছে, এটা কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না। যে সব অনন্যসাধারণ পুরুষবর্ষভরা মেয়েদের নিয়ে সিনেমা-থিয়েটার-রেস্তোরাঁয় যেত, তাদের প্রতি সবাই বিস্মিত, ঈর্ষা-জর্জরিত নেত্রে চেয়ে থাকত। তাদের হাবভাবে মনে হত যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে এরা রাসলীলা শিক্ষা দিয়েছে। অবিশ্যি আর পাঁচটা জিনিস ভদ্রলোক সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শিখে থাকতে পারেন। এই সব নায়কোচিত সর্বগুণান্বিত তরুণদের পাশে নিজেদের বড়ই নগণ্য মনে হত।

প্রেম ব্যাপারটা যে বরিশালী ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, তা' নয়। কিন্তু সেখানে সব কিছুতেই প্রচণ্ড পৌরুষ, আর এ তো পৌরুষ-প্রকাশের একান্তই ন্যায্য ক্ষেত্র। মধ্যযুগের ইউরোপের মতো চল্লিশের দশকের বরিশালেও প্রণয়চর্চার কতকগুলি সর্বজনমান্য রীতি ছিল। হুট করে গাঁওয়ারের মতো একটা কিছু করে বসলেই চলত না। এক সফল প্রেমিকের উক্তি থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যাতে ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয় : "হ্যারে দেইখ্যা ত" পেরথমেই লাভে পড়িয়া গেলাম। হ্যার পর নদীর ধারে দুই দিন 'ফলো' করলাম। তিনদিনের দিন একটু আন্ধার হইতেই ফোকাস মারলাম। [অর্থাৎ তার গায়ে টর্চের আলো ফেললাম]। হে ফিরিয়া একডু হাসলে। বোঝলাম, ওষুধ ধরছে। পরের দিন একঠা চিডি ছুড়িয়া দিলাম।" দ্বিধাহীন, মরুভূমির সূর্যালোকের মতো প্রখর, প্রত্যক্ষ প্রেম। কলেজ স্ট্রিটে এসব চলত না।

কিন্তু পৌরুষ ত' বরিশালের একচেটিয়া ব্যাপার না। সর্বদেশে সর্বকালেই বসুন্ধরা যাদের ভোগ্যা সে রকম বীর জন্মগ্রহণ করে। হঠাৎ হস্টেলে প্রচণ্ড উত্তেজনা। "ঐ মহামানব আসে।" টোমোরি হস্টেলের কুণ্ডুবাবু ডাফে আসছেন। কোনও প্রতিবেশীর বাড়ির উঁচু দেয়াল টপকে তিনি গৃহবধূর সঙ্গে প্রেম করায়, ব্যবসায়ী স্বামী সুপারিনটেন্ডেন্ট কেলাস সাহেবের কাছে নালিশ

করেছেন। সাহেব ন্যায্য উত্তর দিয়েছেন, ''How can I control fifty bulls, when you cannot control your one cow?'' —আমি এই অর্ধশত ষণ্ডকে কি করে সামলাব ? তুমি তোমার একটি গাই-ই সামলাতে পার না। কিন্তু কিছু একটা করতে হল। এক রবিবারের সকালে গোটা তিনেক স্টিলের ট্রাঙ্ক, একটা হোল্ডল এবং গলায় অপ্রত্যক্ষ প্রসূনমালা পরে বীরকুলতিলক কুণ্ডুবাবু ডাফ হস্টেলে আবির্ভূত হলেন। অবিলম্বে তাঁর ঘরে ভিড় জমল। শ্রীকুণ্ডুমাহাত্ম্য তাঁর মুখেই সবাই শুনতে চায়। কুণ্ডুবাবু ধীরেসুস্থে তাঁর কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বললেন। নিস্তব্ধ বিস্ময়ে আমরা শুনলাম। শুধু ভিক্টোরীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সত্যমাধবের কাছে ব্যাপারটা নিন্দনীয় মনে হল। সে বলল, "আচ্ছা কুণ্ডুবাবু, আপনি অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করলেন, আপনার বিবেকে বাধল না ?" কুণ্ডু ন্যায্য ক্রোধে ফেটে পড়লেন : "সত্যমাধববাবু, আপনি কি চান আমি কুমারী মেয়ের সর্বনাশ করি ?"

হস্টেলে সবাই পড়াশুনা করতে এসেছিল এ কথা মনে করলে নিতান্ত ভুল হবে। যেমন ধরুন দাশরথি চ্যাটার্জি [আসল নামটা চেপে গেলাম]। সে একটা নীল পাতলুন আর লাল শার্ট পরে ঘুরে বেড়াত। ঘুরে যে খুব বেড়াত তাও না, কারণ অধিকাংশ সময় সে বিছানায় শুয়ে বাঁশী বাজাত। মাস্টারদের জ্বালাতে মাঝে মাঝে ক্লাসে যেত। হস্টেল এবং কলেজের যাবতীয় আইন ভঙ্গ করার অপরাধে একদিন অনিবার্যভাবে তাকে জরীন হল। হস্টেলের ঘরে তিনদিন পর্যন্ত অতিথি রাখা চলত। আইনের এই ফাঁকটি সদ্ব্যবহার করে বালাসোরবাসী ভবেশ রায়ের ঘরে দাশরথি আস্তানা গাড়ল। তিনদিনের মাথায় সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভবেশকে ডেকে বললেন, "আজ বিকেলের মধ্যে দাশু চলে না গেলে তোমাকেও বের করে দেওয়া হবে।" জোড়হস্তে ভবেশ আবেদন করল, "বাপ দাশু, বেরো বাপ ! নইলে আমিও পথে বসব।" স্মিত হেসে দাশু অভয়বাণী দিল, "কিস্‌সু ভাববেন না ভবেশদা ! আমি একটু পরেই চলে যাব।" প্রাণের আহ্লাদে শিস্ দিতে দিতে ভবেশ বিকেলে কলেজ থেকে হস্টেলে ফিরল। কিন্তু গেট পার হয়েই তার হৃৎপিণ্ড কয়েক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। একটি মধুর বংশীধ্বনি যেন তার ঘর থেকেই আসছে। তিন লাফে সিঁড়ি টপকে ঘরে গিয়ে দেখে, ঠিকই ধরেছে। দাশু শয্যায় লম্বমান, স্মিত মুখে বাঁশের বাঁশী। পরাজিত বিধ্বস্ত ভবেশ আর্তনাদ করে উঠল, "বাপ দাশু ! শালা তুই এখনও বেরসনি ?" দাশু ভবেশের বাপ না শালা এই নিয়ে হস্টেলে দীর্ঘদিন আন্দোলন চলে। কারণ দুটোই যুগপৎ হওয়া স্মৃতিবিরুদ্ধ।

আইনরক্ষকদের কি করে টিট করা যায় সেটা শেখাল মুখলেসুর রহমান। গরমের ছুটিতে দেশে গিয়ে সে এক বালিকাবধূ বিয়ে করে ফিরল। পরশুরাম-বর্ণিত উদোর মতো প্রতি কথায় সে বউর গল্প করতে চায়। কিন্তু ওদিকে গেলেই আমরা ওর গলা টিপে ধরতাম—প্রায় আক্ষরিক অর্থেই। এ ব্যাপারে সহিষ্ণুতা দেখান সম্ভব ছিল না। দেখালে জীবন দুর্বিষহ হত। কিন্তু যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ? রহমান সাহেবের পত্নীপ্রেম অপ্রত্যাশিত রূপ নিল। হঠাৎ দু দিনের জন্য বাড়ি গিয়ে সে ফিরে এল। সঙ্গে মিষ্টি চেহারার ছোটখাট একটি মানুষ, পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখলেসুর তার পরিচয় দিল,

"আমার ভাই, চাঁদ।" কথাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, মানুষটি ওর বোন হলেও হতে পারত। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম, ওর বউর নাম চাঁদ। এক বাড়িতে আর কটা চাঁদ ওঠে? সবাই অপ্রস্তুত। কিন্তু কিছু বলার মতো ঠোঁটকাটা কেউ নেই। সুপারিনটেনডেন্ট লজ্জায় অধোবদন, সবাইকে এড়িয়ে পেছনের দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা করেন। বখারা আড়ালে-আবডালে মুখলেসুরকে চেপে ধরে, "বল্ শালা, চাঁদমিঞা না চাঁদবিবি?" কিন্তু এসব মশার কামড় অগ্রাহ্য করে সে একমাস দিব্যি কাটিয়ে দিল, তারপর গরমের ছুটি পড়তেই অতিথিকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি।

কলকাতার নিস্তরঙ্গ জীবনে ক্রমে যুদ্ধের ঢেউ এসে লাগল। রাস্তায় সাদামুখ জি. আই. আর টমির ভিড়। কোনও কোনও দোকানে "out of bounds to military personnel" লেখা। আর একটু উচ্চকোটির কাফে-রেস্তোরাঁ কার্যত কালো লোকের কাছে "out of bounds" হয়ে গেল। জাপানীরা বার্মায় ঢোকায় ইংরেজ-বিদ্বেষী সরলবুদ্ধি মানুষ বেশ খুশি। ততদিনে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করায় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। IPTA গান বেঁধেছেন, "দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।" রাত্রে মাঝে মাঝে সাইরেন বাজে, কখনও দিনেও। যদিও বোমা পড়তে পড়তে সেই '৪৩ সাল হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে লোকজন পূর্ববঙ্গে পালাচ্ছে। শেষটায় আত্মীয়স্বজনের হেলাছেদ্দা অসহ্য হওয়ায় বোমার ঝুক্কি মাথায় নিয়ে সবাই প্রায় ফিরে আসে। জা-ননদের ঠেস দিয়ে কথার চেয়ে জাপানী বোমা অনেক সহজে সওয়া যায়। ক্রমে রেঙ্গুন জাপানীরা নিয়ে নিল। কয়েক লক্ষ ভারতীয় বনজঙ্গল পার হয়ে কোনওমতে বঙ্গভূমিতে পৌঁছলেন। তাদেরই কয়েকজন ডাফ হস্টেলে বাসা বাঁধলেন। অবাক চক্ষে দেখলাম, এঁরা সবাই ঠিক নিঃস্ব নন। গায়ে সার্ক স্কিন, পাম বিচ ইত্যাদি দামী-দামী কাপড়ের স্যুট। অহোরাত্র আবদাল্লা, 555 ফোঁকা চলছে। ঘরে 'বিলৈতি'র প্রদর্শনী। এঁদের কেউ কেউ নৈশভোজনের পর দল বেঁধে বিহারে যেতেন, ফিরতেন অনেক রাত্রে। আমরা এই স্বর্ণমণ্ডিত তরুণদের বিশেষ সমীহ করে চলতাম।

যুদ্ধ ব্যাপারটা সরল না, জটিল। ওতে নিত্যিনতুন অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন ব্যবহার হয়, নানারকম দুর্বোধ্য কল-কৌশল করতে হয়। এ সব ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যাঁরা সর্বজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা সুযোগ পেলেই গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেন। একজন বললেন, হিটলারের আর জেতার আশা নেই। কারণ মার্শাল টিমোশেঙ্কু ভরশিলভ নদীর তীরে জার্মান প্যান্থার বাহিনীকে রাম ঠেকান ঠেকিয়ে দিয়েছেন। হস্টেলের পাশের গলিতে একজন বয়স্ক রকবাজ ভুঁড়িতে তেল দিতে দিতে যুদ্ধসংবাদের সমীক্ষা করতেন। লোকটি অতি বুদ্ধিমান, ধরাছোঁয়া চলে এমন কোনও বিষয় অকারণে উল্লেখ করতেন না। এক রোববারের সকালে চেঁচিয়ে ডাকলেন, "ওহে ছোঁড়া, কাগজটাগজ পড়া হয়?" বললাম, অল্পবিস্তর হয়। তখন প্রশ্ন, "দেখেছ, স্টার্লিং কেমন কড়কে দিয়েছে?" লেলিনের উত্তরাধিকারী স্টার্লিং কাকে, কখন, কেন এবং কিভাবে কড়কে দিয়েছে সে ব্যাপারটা ধোঁয়াটে রয়ে গেল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে সে

যুগের বৃহত্তম উড়ো জাহাজ Flying Fortress গড়ের মাঠে এসে নামল। আকাশে কোনও বড় প্লেন দেখলেই চর্চা হত ওটা 'উড়ন্ত দূর্গ' কি না। আসামদেশীয় মওলা সাহেব উড়ুক্কু বাহিনীতে ভর্তি হবার জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছেন, সুতরাং আকাশে যা কিছু ওড়ে সে বিষয় তিনি বিশেষজ্ঞ। একটা অতিকায় প্লেন দেখে আমরা বিশেষজ্ঞর শরণ নিলাম। "বলুন মওলা সাহেব, জিনিসটা কি ?" একটু দেখে অবজ্ঞার সুরে উনি বললেন, "ইডা ? ইডা ত Aircraft carrier."

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা হস্টেলে খুবই হত। একদিন চায়ের আড্ডায় জনৈক ছাত্র ডারউইনের কথা তুলল। শ্রীহট্টসন্তান 'নাকু' চৌধুরী এক সিনেমা পত্রিকায় দীর্ঘ নাক ডুবিয়ে কাননবালা এবং প্রমথেশ বড়ুয়ার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করছিল। হঠাৎ চেতনার জগতে ফিরে এসে প্রশ্ন করল, "ক্যার কথা হইথাছে ? শার্ল ডারউইন ? ফয়েট ?"

হস্টেলের অধিবাসীরা চারপাশের জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না। হস্টেলের সামনেই বস্তি। তার বাসিন্দা প্রধানত বিহারী লৌহব্যবসায়ী কালোয়ার আর কিছু, যাকে ইংরিজিতে 'আত্মনিযুক্ত' মানে self-employed বলে, সেই শ্রেণীর বাঙালি, মশলা-মুড়ি বিক্রি থেকে ছুরি-শানান অবধি নানা কাজে এরা ব্যাপৃত থাকত। তাদের ভিতর দু-চারজন গুণ্ডা বা জন-নেতাও ছিলেন। সেই নেতাদের রাজনৈতিক প্রতিভা '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সম্পূর্ণ প্রকট হয়। প্রতি সন্ধ্যায় হরে আর শিবে বলে দুটি চরিত্র গোঁফে মাতাল হয়ে আপোষে লড়াই করত। রাত দশটা-সাড়ে দশটা হলেই শোনা যেত, "আমাকে তোরা ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। শালাকে খুন করে আজ আমি ওর রক্তে স্নান করব।" বিডন স্ট্রিটে দুঃশাসন-বধের আশঙ্কায় আমরা আতঙ্কিত হতাম না। কারণ হরে বা শিবেকে কেউ কোনও দিন ধরে রাখেনি। বস্তুত এই প্রাত্যহিক নাটকের বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটলে অনেকে নিশ্চিন্ত হত। কিন্তু তা হওয়ার উপায় ছিল না। সম্ভবত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রটা ওদের পড়া ছিল। 'বিয়োগান্তাঃ ন নাটকাঃ", এ কথাটা ওরা জানত। তাই শিবে-হরে-সংবাদ পালার শেষ দৃশ্য রোজই মিলনান্ত হত। হরে শিবেকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করে শান্তির বাণী শোনাত, "দ্যাখ শিবে, তুই যদি আমাকে শালা বলিস, আমি তোকে শা-আ-লা বলব। আর যদি তুই আমাকে দা-আ-দা বলিস, ভাই বলে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরব।" এরপর আর চোখের জল সামলান যেত না।

কিন্তু হরের প্রাণের গভীরে একটা বৈপ্লবিক চেতনা ঘুমিয়ে ছিল। তার প্রকাশ হল সন '৪২-এ। নেতারা জেলে, শহরে তিনদিন ধরে কারফিউ। রাস্তায় সাজোয়া গাড়ি ঘুরছে, তার আরোহী স্টেনগান হাতে সিপাই-সান্ত্রী। কিছু করার নেই, ঘরে বসে বসে অগত্যা হরে-শিবে ধান্যেশ্বরী দেবীকে গোঁফ থেকে পেটে স্থানান্তরিতা করছে। শেষটায় হরের সহ্যের সীমানা পার হয়ে গেল। "দুস্ sালার ইংরেজ" বলে অগাস্টের কাঠ-ফাটা রোদে সে বিডন স্ট্রিটে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল। 'যাsনে, মাথার দিব্বি" ইত্যাদি শিবের অনেক কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করে সে শত্রুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এবং

অনুল্লেখ্য দেহভঙ্গীসহ আওয়াজ তুলল, "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"। হাতে অস্ত্র—ভাঙা ইটের টুকরো। সাজোয়া গাড়ি আসতেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ, উত্তরে একটি গুলির আওয়াজ। দু দিন বাদে কারফিউ শেষ হলে কওমী তেরঙ্গা ঝাণ্ডায় মুড়ে শহীদ হরেন্দ্রনাথের শবদেহ নিমতলার ঘাটে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেলাম। দেশ স্বাধীন হলে রাস্তার মোড়ে একদিন ইঁট দিয়ে একটা শহীদ-মঞ্চ তৈরি হল। বরেনের সেলুনে ["এখানে ভদ্রলোকদের নানা স্টাইলে চুলছাঁটা হয়। সাধারণ— চার আনা, বিশেষ ছ' আনা।"] হরের একটা বুশ শার্ট পড়া রঙিন ছবি ছিল। সেই ছবি এনে মঞ্চোপরি স্থাপন করা হল। জনৈক কংগ্রেসী মন্ত্রী এসে ছবিতে মাল্যার্পণ করলেন। ধ্বনি উঠল, "শহীদ হরেন্দ্রনাথ জিন্দাবাদ।" "যুগ যুগ জিও" কথাটা তখনও চাউর হয়নি।

আগস্ট বিপ্লবের কথা যখন উঠল তখন সসঙ্কোচে বলি, লেখকও ঐ সময় মাস দুই শহীদ হয়েছিল। না মরলেই শহীদ হয় না, এমন কোনও কথা নেই। প্রাণ দেওয়া না-দেওয়াটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার, ব্যক্তিগত চেতনার বিষয়। একদা জনসঙ্ঘী এক আন্দোলনে নিষিদ্ধ স্থানে ভাগোয়া ঝাণ্ডা পুঁতে আইন অমান্য করার দায়ে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের কালো মারিয়ায় তুলে পাঁচ মাইল দূরে ছেড়ে দিচ্ছিল। রকবাজ পচাও লড়াইয়ে 'সামিল' হল, বা ঝাঁপিয়ে পড়ল। [পাঠিকা-পাঠক, লক্ষ করেছেন, বাংলা ভাষায় লেখা জীবনী-সাহিত্যে আমাদের নেতারা সর্বদাই কিছু না কিছুতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন? কোথায় পড়ছেন সে বিষয়ে কোনও পরোয়া নেই।] ঝাণ্ডা পুঁততেই পুলিশ পচাকে চ্যাংদোলা করে গাড়িতে তুলল। পচার অন্তিম বাণী এখনও কানে বাজে, "পাড়ায় গিয়ে বলিs, পচা দেশের জন্য প্রাণ দিল।" আমিও মাস দুয়েক দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলাম।

৯ই আগস্ট সকালবেলা বেতারে খবর এল, মহাত্মা গান্ধী-সহ দেশ-নেতারা সবাই বন্দী হয়েছেন। দুপুরের মধ্যেই দেয়ালের গায়ে পোস্টার পড়ল, "ইংরাজ ভারত ছাড়", ''Quit India'' "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।" ইস্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেল। ক'দিনের মধ্যেই গোপন সূত্র থেকে অস্পষ্টভাবে ছাপা ইস্তাহার আসতে লাগল—কিভাবে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই করতে হবে তার বিধান দিয়ে। গুজবে শহর ছেয়ে গেল। শুনলাম জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং অরুণা আসফ আলি পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন। বিহার, অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে নাকি জোর লড়াই চলছে। শত শত মাইল রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়েছে। টেলিগ্রাফের তার কাটায় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার এক প্রধান অঙ্গ সংবাদ যাওয়া-আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, পুলিশ আর ভারতীয় সেপাইরা নাকি হাজারে হাজারে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিচ্ছে। এক বছর না, সাতদিনে স্বরাজ হবে। এর আগে ক্রিপ্‌স্ সাহেব এসেছিলেন। তখনও শুনেছিলাম আজাদী দোর গোড়ায়। ওদিকে যে বিলেত থেকে চার্চিল সাহেব কড়কে দিচ্ছেন, সে কথা তখন কেউ জানত না।

হস্টেল বন্ধ হয়ে গেল। তারকাটা, রেল লাইন ওপড়ান, পোষ্টাফিস পোড়ানর বিধান সম্বলিত সাইক্লোস্টাইল করা কাগজের তাড়া নিয়ে বরিশাল ফিরে গেলাম। বরিশালবাসীর প্রতি বিশেষ নির্দেশ— সরকার ফৌজের জন্য

চাল-ডাল সংগ্রহ করছে। তার পথ বন্ধ করে যুদ্ধ প্রচেষ্টা জখম কর। "আমাগো বালাম চাউল আর মুহুরির ডাইল, হেইয়া হালাগো দিতে বইছি ?"

কলকাতা ছাড়ার আগেই শুনলাম— চেনাশুনা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বন্দী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন একটু কল্পনা-প্রবণ ছিলেন। তাঁর বিষয় প্রমথ বিশী বললেন যে ভদ্রলোক নেহাৎ মিথ্যে কথা বলে জেলে গেলেন। কথাটা বিশী-দার জবানীতেই লিখি : "পর্শু বললেন পোষ্টাপিস পোড়ানর জন্য দশ মণ কেরোসিন ওঁর বাড়িতে রেখে গেছে। কাল বললেন, অরুণা আসফ আলি সারারাত ওঁর খাটের নীচে বসে ছিলেন। এ সবও পুলিশ সহ্য করে ছিল। আজ যেই বললেন, যে গত রাতটা উনি রাসবিহারী এভিন্যুর দেবদারু গাছে বসে বিপ্লবীদের নির্দেশ দিয়েছেন, অমনি পুলিশ এসে ওঁকে ধরে নিয়ে গেল।"

বরিশালগামী স্টীমারে দেখলাম রাজনৈতিক তাপমান ১২০° ডিগ্রী ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে ফিরে চলেছে অফিস-কাছারি বন্ধ বলে। কিন্তু যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে 'ঝাঁপিয়ে পড়া'র জন্য জন্মস্থানে ফিরছেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। দ্বিতীয় দলে একজন খ্যাতনামা বরিশালজ পণ্ডিত, আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। আমাদের দ্বিধাহীন ক্লাসিকাল সংস্কৃতির উনি একজন প্রথম শ্রেণীর ধারক ও বাহক ছিলেন। প্রথম যেদিন কলকাতায় ওঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলাম, দেখলাম উনি শীর্ষাসনে ; পরিধানে কৌপীন। আধঘন্টাটাক পর যোগাভ্যাস শেষ হল। বললেন, "পরীক্ষায় ত' ভালই করছ। ঠিক মত মনঃসংযোগ হয় ?" জানালাম,— মোটামুটি হয়। উনি বললেন, "হেয়া জিগাই নাই ? বয়সোচিত ক্লেশের ফলে চিত্তবিক্ষেপ হয় না ?" হয় না, 'হেন মিথ্যা কেমনে কহিব' চুপ করে রইলাম। উনি বললেন, "য়্যাথে লজ্জার কিছু নাই। দেহধর্ম। আসনাদি কর ?" দু-চারটে করতাম, বললাম। "সিদ্ধাসন জান ?" "আজ্ঞে না।" "শিখাইয়া দিতে আছি। এথে চিত্ত শুদ্ধ থাকে।" বলে 'যোগ-দীপিকা' খুলে demonstration-সহ একটি আসন-পদ্ধতি বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। মূল সংস্কৃত কিছুটা উদ্ধৃত করছি, বঙ্গানুবাদ চলবে না : "বামপদমূলং সীবন্যাং নিসীদ্য, দক্ষিণপাদমূলেন মেঢ্রং পরাং নিপীড্য ..." পাঠকগণ, ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চেষ্টা করে দেখবেন। সিদ্ধাসনে সিদ্ধি হলে চিত্ত চিরকালের মত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এই সাধনার পথ ক্লেশহীন নয়।

স্টীমারের তৃতীয় শ্রেণীর ডেকে প্রচণ্ড ভীড়। তারই ভিতর জায়গা করে নিয়ে অধ্যাপক মশায়কে ঘিরে বসেছি দশ পনের জন। উনি রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন। বিশ এবং ত্রিশ সনের সঙ্গে বেয়াল্লিশের তফাতটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ একজন প্রবীণ দেশপ্রেমিকের জ্ঞানপিপাসা অন্য পথ নিল। তিনি জালের আড়ালে ইন্টার-ক্লাসবর্তিনী একটি অতিকায়া মহিলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "আচ্ছা, কয়েন দেহি, আপনে ত' অনেক পড়াশুনা করছেন ? এই সব মাইয়া লোকে সহবাস করে কেমন করিয়া ?" অধ্যাপক একটু চিন্তা করে নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, "কেন ? হস্তীতে যেরূপে করে।" আলোচনা তখনকার মত ক্ষান্ত হল।

বরিশাল অঞ্চলে ১৯০৫ সন থেকেই বৈপ্লবিক চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে।

আমাদের জেলায় 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' দুই দলেরই অনেক কর্মী ছিলেন। অগ্নিযুগের নেতারা তিরিশের দশকে গান্ধী বা মার্কসবাদী রূপে নতুন ভূমিকায় আবির্ভূত হন। অনেক সর্বভারতীয় নেতাই বরিশাল সফরে আসতেন এবং অনেক সময়েই অশ্বিনীবাবুর বাড়ি, চেরামদ্দি-সদন অথবা নাবালক-লজে অতিথি হতেন। আমার বয়স তখন বছর চারেক। একদিন শুনলাম মস্ত বড় একজন মানুষ আমাদের বাড়িতে এসে দু-দিন থাকবেন। পরম রূপবান গৌরবর্ণ যে ব্যক্তিটি এলেন,— তাঁকে দেখে কিছুটা নিরাশ হলাম। আর পাঁচজনের তুলনায় উনি দীর্ঘদেহী ঠিকই, কিন্তু ভেবেছিলাম 'মস্ত বড়' মানুষ অন্তত দশ হাত উঁচু হবেন। সবাই বলল, 'উনিই সুভাষবাবু।' সকাল বেলা তিনি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। মা-বাবার নির্দেশ অমান্য করে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কেন মানুষটি 'মস্ত বড়' বুঝবার চেষ্টা করছি। আমাকে দেখতে পেয়ে উনি ঘরের ভেতরে ডেকে নিলেন। জিগেস করলেন, 'ক, খ শিখেছ?' অসত্য উত্তর, 'হ্যাঁ'। তারপর হাতে একটা পেন্সিল আর কাগজ দিয়ে বললেন, "লেখ দেখি,— 'বাবা'।" চুপ করে থাকায় বললেন, "আচ্ছা, তা হলে লেখ 'কাকা'।" কথাটা উচিত হয়নি। যে বাবা লিখতে পারে না, সে কি আর কাকা লিখতে পারবে? আমার নিরক্ষরতা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ হল। পরবর্তী জীবনে অনুরূপ বে-ইজ্জতি বারবারই ঘটেছে।

আজকাল বিদেশী ঐতিহাসিকরা যখন লেখেন যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নেহাত-ই কথার তুবড়ি, স্বার্থের ধান্দার মাছ ভাবাবেগের শাক দিয়ে ঢাকার চেষ্টা, তখন অনেক কারণেই গাত্রদাহ হয়। একটা প্রধান কারণ, শৈশবে-কৈশোরে খুব কাছের থেকে কতগুলি মানুষকে দেখেছিলাম, যাঁদের দেশের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনও স্বার্থবোধ ছিল না। বাংলায় 'দেশাত্মবোধ' বলে একটা কথা চলে যার মানে করলে দাঁড়ায় দেশের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিসত্তা মিলিয়ে দেওয়া। যাঁদের কথা বলছি তাঁদের দেশবোধই শুধু ছিল, আত্মবোধ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। কেউ বিশ কেউ ত্রিশের দশকে এঁরা সন্ত্রাস বা অসহযোগের পথে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টায় নামেন। অনেক অভাব-অনটন-নির্যাতন সহ্য করে সেই চেষ্টায় তাঁরা শেষ অবধি অটল থাকেন। দেশ যখন স্বাধীন এবং দ্বিধা-বিভক্ত হল, তখন এই লোকগুলি যেন ছায়ার মত মিলিয়ে গেলেন। আজ যখন দেশী বা বিদেশী কোনও ঐতিহাসিক ঠাট্টার সুরে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'Freedom struggle' কথাটা উচ্চারণ করে গাল বেঁকিয়ে হাসেন, তখন ওঁদের কথা মনে পড়ে আর আরবির মৌলভী সাহেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এককোই থাবড়ে বখাদের মাথার মগজ 'ফানি' করে দেওয়ার ইচ্ছে হয়।

'মহামানবের' লক্ষণগুলি কি জানি না, কিন্তু একটি মানুষকে কাছের থেকে দেখেছিলাম যাঁর সঙ্গে স্বার্থবোধচালিত সাধারণ মানুষের কোনও মিল খুঁজে পাইনি। তাঁর ঘর-বাড়ি-পরিবার-জীবিকা কিছু ছিল না। আরও একটি জিনিসের ওঁর নিতান্ত অভাব ছিল— ভয়। কখনও সহকর্মীদের বাড়ি, কখনও টাউন হলের একটা ঘরে তিনি থাকতেন। বন্ধু-বান্ধবরা পালা করে ওঁকে খাওয়ার পাঠাতেন। পাঠাতে ভুল হলে সেদিন আর খাওয়া হত না। বরিশালের দরিদ্র মানুষের নানা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা এবং দেশের

স্বাধীনতার লড়াইর জন্য যুব সমাজকে তৈরি করা— উদয়াস্ত এবং সারা জীবন এই দুটি কাজ নিয়েই ওঁর কেটেছে। অবশ্যি জীবনের অনেকগুলি বছরই গেছে জেলবাসে। "কোন্ আলোকে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে, তুমি ধরায় আস" —এক সময় মনে হত এই গানটা সতীনদার কথা ভেবেই লেখা। 'যুগান্তর' দলের সন্ত্রাসবাদী নেতা সতীন্দ্রনাথ সেন জীবনের শেষ অধ্যায়ে পুরোপুরি গান্ধীবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। একটা ওয়ার্ধা চরখা ওঁকে কে উপহার দিয়েছিল। তাতে উনি রোজ সূতা কাটতেন। একদিন চরখা চালানর আত্মিক সুফলগুলি বর্ণনা করে উনি বলেছিলেন যে, এতে মনটা শান্ত হয়ে যায়। ক্রোধরিপু যার প্রবল তার পক্ষে সূতা কাটাই মুশকিল। অগ্নিময় ঐ মানুষটি ঠিক ক্রোধশূন্য ছিলেন না। ওঁর একজন অনুগামী বলল, "সতীনদা, একটা কথা জিগামু ?" "বল্।" "আপনার হাতে কি সূতা বাইর হয় ?"

অগাস্ট আন্দোলনের গোড়ায়ই সারা দেশে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। বরিশালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস নাগাদ যার গায়ে জাতীয়তাবাদের বিন্দুমাত্র গন্ধ ছিল তাকেই জেলে পোড়া হল। সতীনদাকে কলকাতায় গ্রেফতার করে আলিপুর জেলে রাখা হয়। তাঁর দলের সবাই বরিশাল জেলে রাজার অতিথি হলেন। আমাদের জেলায় আন্দোলন ভেজা তুবড়ির মত জ্বলে উঠতে না উঠতেই নিভে গেল, কারণ আন্দোলন চালাবার মত লোক আর কেউ জেলের বাইরে রইল না। পোস্ট অফিস পোড়ান, টেলিগ্রাফের তার কাটা আর চাল-ডাল সংগ্রহের সরকারি আয়োজন বন্ধ করার সামান্য যে চেষ্টা হয়েছিল, তার ভার বালখিল্যদের হাতে পড়ল। পুলিশের কর্তারা তাদের দুদিনে ঠেঙিয়ে টিট্ করলেন। টিট্ হতে যাদের ইতস্তত ছিল তাদের জেলহাজতে পূরে তৃতীয় শ্রেণীর আসামীদের সঙ্গে রাখবার ব্যবস্থা হল। '৪২-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বাবা এবং দাদা গ্রেফতার হলেন। নভেম্বর মাসে আমি হাজতে ঢুকলাম।

ন্যায়বিচারক ইংরাজের রাজত্বে বাক্য এবং কার্যের ভিতর তফাতগুলি কি রকম সূক্ষ্মভাবে চালু থাকত '৪২-এর হাঙ্গামার ফলে তার কিছুটা আঁচ পেলাম। জানলাম, সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী বন্দীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যাঁরা ইট ভিন্ন অন্য কোনও মাল-মশলায় তৈরি বাড়িতে বাস করে, তাদের জন্য ঢালাও ব্যবস্থা তৃতীয় শ্রেণী। অর্থাৎ কম্বল শয্যায় মাটিতে শয়ন এবং অভক্ষ্য ভক্ষণ। পাকা বাড়ির বাসিন্দারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। সেখানে খাট-পাট ছিল, খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের হাতে নিতে পারলে কলেজ হস্টেলের চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ না। প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাগুলি জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মর্জির উপর। কর্তাটির মর্জি হলে— প্রথম শ্রেণীর বন্দীর খাওয়াটা বাড়ি থেকে আসতে পারত। এ ছাড়া ক এবং খ-য়ে অন্য কোনও তফাত ছিল না। কিন্তু বন্দী দ্বিতীয় না তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বে সেটা ঠিক করা হত পুলিশের রিপোর্টের উপর। রিপোর্টের বিষয়— তার বাসস্থান পাকা কি না। বাবা যেদিন গ্রেফতার হলেন সেদিনই তাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হল। দাদার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ছিল। সুতরাং সে কাঁচা না পাকা বাড়িতে থাকে আবিষ্কার করতে তিন মাস সময় লাগে। আমি ছেলেমানুষ

বলে সাতদিনের মাথায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হই। একই পাকা বাড়ি থেকে তিন জনকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল।

কি অভিযোগে গ্রেফতার হলাম জিগেস করায় থানার ইনস্পেক্টার বললেন— তারকাটা এবং চুরি। কি চুরি করলাম সে প্রশ্নের উত্তর, "তার"। লজিক কিছুটা পড়েছিলাম। তাই যুক্তিটা ভারী সন্তোষজনক মনে হল। তার কি কেউ শুধু শুধু কাটে ? কেটে পকেটে পূরে চড়া দরে বাজারে বেচে। আসলে সারা জেলায় গোটা কয়েক পোস্টাফিসে আগুন দেওয়া হয়েছিল, দু-চার জায়গায় তার কাটা হয়েছিল। এর প্রতিটি ঘটনা পুলিশের খাতায় এক একটি 'কেস' বলে লেখা হয়। 'কেস' সংখ্যায় যথেষ্ট না হওয়ায়, কয়েকটি 'কেস' কল্পনা করা হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করা হলে তাকে একটা না একটা কেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত। হাজতবাসী বিপজ্জনক লোক হলে তিন মাসের মধ্যে তাকে ভারত রক্ষা আইনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী রাখার হুকুম আসত। চুনোপুঁটিদের মাস তিনেক বাদে ধমক-ধামক দু-চারটে চড়-থাপড় দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের 'শিশু বিভাগ' বা জুভেনাইল ওয়ার্ডে ঢুকি। সেখানে জনা তিরিশ বালক কম্বলাসনে শুয়ে বসে। বেশীর ভাগই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের শহীদ। গুটি দুই গাঁটকাটা দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে। ঘরে ঢুকতেই একটা বিকট গন্ধ নাকে এল। ভাবলাম মেথর ময়লা পরিষ্কার করছে। নাকে কাপড় দেওয়ায় সহবন্দীদের অট্টহাস্য : "অ মনু ! এহনই হইলে কি ? দুই চার দিন থাক, টের পাবা হ্যানে।" যে সুবাস পুরীষ-প্রসূত ভেবেছিলাম, সেটা আমাদের অন্নের। জেল-কর্মচারীরা ধান সিদ্ধ করতে গিয়ে কোনও ভাবে তাকে পচিয়ে ফেলেছে, তারই সুগন্ধ। মাথা পিছু দুখানা চাপাটিও ছিল। সেগুলির বিচিত্র ছাল খসানর জন্য দু হাতে দুটি ধরে সবাই খুব ঘষতে লাগল। ঘষা শেষ হলে বাটিতে জল ঢেলে সেগুলো ধোওয়া হল। করুণাময় সরকারের ব্যবস্থা,— রোজ দু' বেলা কয়েদীদের ডাল-ভাত-রুটি ছাড়া মাথাপিছু দৈনিক এক পোয়া তরকারি দিতে হবে। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে শুধু ডাল-ভাত মিলত। রাত্রে মাথা গুণে এক পোয়া তরকারির প্রমাণসাইজ এক একটি চাকা ডালে দেওয়ার ব্যবস্থা। চাকাটি প্রায়শঃই কচুর। তার সঙ্গগুণে ডালটাও তেজস্কর হয়ে উঠত। মুখে দিলেই গলা দিব্যি ফুলে উঠত। অন্য তরকারি হলে ডালটা খাওয়া যেত। একপোয়া ওজনের তরকারির চাকা কখনও সেদ্ধ হত না। ওটা খাওয়ার অপচেষ্টা কেউ করত না।

এ ছাড়া আমাদের উপর কোনও অত্যাচার হত না। কম্বল ছেড়ে মাটিতেই শুতাম, কারণ মৎকুন-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই জিতে কম্বল-অধিকার করা সম্ভব ছিল না।

হঠাৎ একদিন কোনও তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে পাগলা ঘণ্টি, বা alarm bell, বেজে উঠল। তখন আমরা জেলের খোলা জায়গায় হাঁটছিলাম। ঘণ্টি বাজতেই দাদারা চেঁচালেন,— "ওয়ার্ডে ঢুক্কিয়া পড়।" পুরনো রাজবন্দীরা জেলের ভিতর ঠ্যাঙানির নিয়ম-কানুন জানতেন। তারা সবাইকে হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজে মণ্ডলী করে বসতে বললেন। যাঁরা শক্তিমান ও আগে মার খেয়ে

অভিজ্ঞ, তাঁরা মণ্ডলীর বাইরের সারিতে বসলেন, বাকীরা চক্রব্যূহের ভেতরে। একটু পরেই পুলিশ এবং জেলের 'মেট'রা লাঠি এবং চামড়ার বেল্ট হাতে এসে গেল। মিনিট পাঁচেক বেধড়ক এলোপাথারি মার চলল। দু'চারজনের মাথা ফাটল। তাঁদের জেল হাসপাতালে নিয়ে গেল। যথাকালে তাঁদের জেলের ভিতর হাঙ্গামা বাধাবার অপরাধে লম্বা মেয়াদের শাস্তি হল। অনেকে বললেন,— পাগলা ঘণ্টির উদ্দেশ্য ছিল এইটাই।

জেল হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা অতি মনোরম। প্রধানত দুটি ওষুধ ওখানে ব্যবহার হত— আইয়োডিন এবং ক্যাষ্টর অয়েল। দ্বিতীয় বস্তুটি কয়েদীদের মধ্যে কাষ্ঠ তৈল নামে পরিচিত ছিল। পরিণাম চিন্তা করে ওটা কেউ বেশী খেতে চাইত না। সুপথ্যরও ব্যবস্থা ছিল। কামলা হয়ে সপ্তাহ দুয়েক হাসপাতালবাসী হই। পথ্য হিসেবে নানান ফল খাওয়ার ব্যবস্থা দেন ডাক্তার সাহেব। আর প্রচুর পরিমাণে ডাবের জল খেতে বলেন। জেল কর্তৃপক্ষের কৃপায় জলের কোনও অভাব হয়নি। তবে ডাবের না, কলের। ফলটল অবশ্যি ছাড়া পাওয়ার পরই খাই। 'জেল কোড' অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের রোজ মাছ-মাংস দেওয়ার কথা। ভুঁড়িস্মান জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট একদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছেন। পুলিশের লাঠিতে মাথা-ফাটা জনৈক রাজবন্দী জানতে চাইলেন যে মাংস বস্তুটা কখনও পাওয়া যাবে কি না ; কর্তা বললেন— জেলের বাইরে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব, মাংসটাংস কি আর আছে ? আমরা কি সুখে আছি, সেটা যদি আমরা একটু বুঝতাম। বন্দী নিষ্পাপ শিশুর কণ্ঠে প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "ক্যান্, তোমার প্যাডে [পেটে] দেহি কত মাংস ?"

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রোমোশন পাওয়ার পর দেখলাম— বেশ জায়গা। বাবা, দাদা, চেনাশুনা নানা বয়সের রাজনৈতিক কর্মী সবাই-ই লম্বা একটা ঘরে বসবাস করছেন। আর তাঁর পূর্বজন্মকৃত পাপ এবং ইহজন্মকৃত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে এক মওলানা সাহেবও আছেন। যাদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছেন, একই ওয়ার্ডে তাদেরই কয়েকজন। তারা তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করত। ঘুম ভাঙতেই উদাত্ত সুরে প্রভাতী সঙ্গীত শোনা যেত,—

"ও আমার মৌলানা
তুমি কদুর ছালন খাইলা না।"

মওলানা সাহেব ভব্যিযুক্ত লোক— সাগরেদদের কদম-বুসি বা পদচুম্বন পেতে অভ্যস্ত। সহবন্দীদের অভব্য ব্যবহারে বড়ই পীড়িত হতেন। আহত ইজ্জত কিছুটা পুনরুদ্ধারের ভরসায় আমাকে উনি উর্দু শেখাবেন ঠিক করলেন। অক্ষরটা পরিচিত ছিল। সুতরাং প্রথম পাঠ হল শ্রুতিলিখন। মওলানা সাহেবকে অভিবাদন করে চিঠি দিয়ে শ্রুতিলিখন শুরু হল, "বাখেদমত্-এ-শরিফ জনাব ফয়জল-লতিফ কি পাস্ বান্দাকা ইয়ে আরজ্ হ্যায়।" শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এই গম্ভীর গুরুবন্দনার পর বান্দার উর্দু-শিক্ষা আর এগোয়নি। মওলানা সাহেবের জীবিকা উপার্জন হত প্রধানত তাঁর হেকিমী ওষুধের দোকান থেকে। সে সব ওষুধ নাকি অমৃততুল্য,— কাজ এবং আস্বাদ দুয়েই। হজরত কারামুক্ত হলে ওঁর দাওয়াত রাখতে একবার ওঁর

হেকিমী দাওয়াখানায় গিয়েছিলাম। বিচিত্র রঙের পানীয় ও খাদ্য উনি সামনে ধরে দিলেন। জিনিসগুলি নাম-গৌরবেও মহীয়ান— হালুয়া-এ-নওজওয়ান, শাহী সরবত্, বিজলী-কি খাম্বা, হালুয়া পালঙ্কতোড় ইত্যাদি ইত্যাদি। চেখে দেখলাম— বেশ খেতে। কিন্তু কোনও অপার্থিব শক্তি আমাকে রক্ষা করছিলেন। সম্ভবত তাঁরই নির্দেশে জিগেস করলাম— এসব খাওয়ার সুফল কি ? হুজুর বললেন, "দ্যাখবা হ্যানে। পাশের বাড়ির দেয়াল-দর্জা ভাইঙ্গা ফেলাবা।" কাজটা ঠিক গঠনমূলক হবে না চিন্তা করে জনাব ফয়জল-লতিফকে আদাব জানিয়ে বান্দা বিদায় নিল।

আমাদের জেইলার ছিলেন পরবর্তী যুগের এক খ্যাতিমান লেখক। সময় পেলেই মুখে একগাল হাসি এবং হাতে মোটা খাতা নিয়ে ওয়ার্ডের তালা খুলে উনি ঢুকতেন। এবং একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা ধরে এক নাগাড়ে ওঁর লেখা পড়ে শোনাতেন। সেই মহৎ সাহিত্যের মূল্য আমরা বুঝিনি। সবাই বলতেন,— এই পাঠ শুনিয়ে কৌশলী সরকার বিনাশ্রম কারাদণ্ডটা সশ্রম করে দিলেন। যাঁদের ঘানি টানার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁরা বললেন, জেইলারের পাঠ শোনার চেয়ে সে কাজটায় ক্লেশ অনেক কম হত।

জেলের কয়েদীদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা ছিল কতকটা মেলবন্ধনের নিয়ম অনুযায়ী। অর্থাৎ যার অপরাধ গুরুতর এবং ফলে কারাবাসের মেয়াদ লম্বা সেই উচ্চবর্ণ হিসাবে অনেক সুযোগ সুবিধা পেত। জেলের ভিতর তাদের প্রধান কাজ ছিল 'মেট' বা সর্দার কয়েদীর ভূমিকায় অন্যদের কাজ পরিদর্শন করা, অর্থাৎ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কোমর থেকে চামড়ার মোটা বেল্ট খুলে বেধড়ক পেটান। যে দিন পাগলা ঘণ্টি বাজে সেদিন এই বেল্টেরই স্বাদ সামান্য পেয়েছিলাম। যাকে বলে ব্রহ্মস্বাদের ভাই-বেরাদর। পিঠের চামড়ায় সেই সুখস্মৃতি অনেক দিন জাগরূক ছিল।

আমাদের সমাজে ইজ্জতের প্রতি মানুষের লোভ বড় বেশী। জেলে দেখতাম,— ছিঁচকে চোরকেও যদি জিগেস করা হত কেন সে জেলে, বুক চিতিয়ে উত্তর দিত, 'ডাকাইতি' অথবা 'র‍্যাপ' [rape]। আমাদের ওয়ার্ডে যে কয়েদীটি 'মেট' ছিল সে বরিশালের এক বিখ্যাত ডাকাত। ফর্সা রং, লম্বা চুল, বলিষ্ঠ চেহারার কান্তিমান পুরুষ। বরিশাল জেল তার নেহাতই চেনা জায়গা, কারণ ওর জীবনের অনেকটাই ওখানে কেটেছে। শেষটায় ওর ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। আপীলে ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হয়। ও বলত— এই খুনটা ও করেনি। পুলিশ কৌশলে মামলা সাজানয় শাস্তি হয়। কিন্তু জীবনে অনেক খুন করেছে— এ কথা অস্বীকার করত না। ওর পেশা ছিল নৌকায় ডাকাতি। শাঁসাল যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে রামদা দিয়ে মাথা কেটে ফেলত— যাতে অপরাধের কোনও সাক্ষী না থাকে। ওয়ার্ডের জানলার ধারে বসে জ্যোৎস্নার রাতে ও গলা ছেড়ে গান করত। গুণাবিবির গান :

জুতাজোড়া পায় দেছে।
জামাজোড়া গায় দেছে ॥
আর টুপ্‌হিটার মাঝখানে
জানি আইচান্ আইচান্ করে রানীর পরাণহিইই ॥

একদিন খবর এল— ওর খালাসের হুকুম হয়েছে। সদানন্দ মানুষটা কেমন যেন মুষড়ে পড়ল। বললাম, "ছাড়া পাবা, এয়া ত' ভাল কথা, ব্যাজার হইছ ক্যান্ ?" উত্তর দিল, "হুজুর, বৌ-পোলাপান আছেলে। তারা কবে কোন্‌হানে চল্লিয়া গ্যাছে, হেয়া জানিও না। গেরামে গেলে, হগলে আমারে দেইখ্যা ভয় পাইবে। যামু কই, খামু কি, কয়েন ? আবার চুরি-ডাকাইতি করতে হইবে, আর ত' কোনও কাম শিখি নাই। আবার এইহানেই ফিরিয়া আমু। আমার আর যাওনের জায়গা নাই। ফাঁসীডা হইলেই ল্যাঠা চুইক্কা যাইত।"

'৪৩ সনের গোড়ায় ডাফ হস্টেলে ফিরে আসি। তার কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতা শহরের জীবনে এক নতুন ব্যাপার শুরু হল। হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম শহরের রাস্তায় ভিখিরির ভীড় বেড়ে গেছে। মা-বাপ ছেলেপুলে-সহ পুরো এক একটা সংসার ফুটপাথে গৃহস্থালী পেতেছে। এত ব্যাপক ভাবে এই রকম দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি। প্রথম প্রথম এরা ভিক্ষেও চাইত না। শহুরে মানুষের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত। জানলাম, ওরা মফস্বল অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় কলকাতা চলে এসেছে, আহার্যের খোঁজে। সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছেন। উদ্দেশ্য দুই— প্রথম সৈন্যদের সরবরাহ করা। দ্বিতীয়— জাপানীরা ভারতবর্ষে ঢুকে পড়লে তাদের যাতে সহজে খাদ্যশস্য না মেলে তার ব্যবস্থা। শিবপুর বোট্যানিক্যাল গার্ডেনসে চালের বস্তার পাহাড় জমেছে। কিন্তু নাগরিকদের মধ্যে খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। ইতিমধ্যে বাজারে চালের দাম সাড়ে তিন টাকা মণ থেকে চল্লিশ টাকা মণ হল, কোথাও কোথাও এক শ'র উপরে উঠে গেল। শহর-গ্রামের সাধারণ ছা-পোষা মানুষ কলকাতার রাস্তায় ভিখিরির বেশে দেখা দিল। "দুটো চাল দাও গো" এই আবেদনটা সম্পূর্ণ নিরর্থক বুঝতে পেরে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব সেই স্লোগান আবিষ্কার করল, "ফ্যান দাও গো, ফ্যান দাও"। দু-চারজন বড়লোক, কিছু সহৃদয় নাগরিক পাড়ায় পাড়ায় লঙ্গরখানা খুললেন। তাতে লপসি বা পাতলা খিচুড়ি বিলি হত। ফলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হল ঠিকই— কিন্তু প্রত্যাশিত ভাবে নয়। লপসি খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভেদ-বমি হয়ে লোক মারা যেতে লাগল। শারীর বিজ্ঞানের একটা অজানা তথ্য এবার শিখলাম। অনেকদিন অনাহারে থাকলে মানুষের পেটে খাবার হঠাৎ সহ্য হয় না। ওষুধ, তরল জিনিস এই সব দিয়ে তাকে খাদ্য নামক বিস্মৃত বস্তু গ্রহণের জন্য তৈরি করতে হয়।

রাস্তায় মরা মানুষ পেরিয়ে হাঁটাটা বেশ অভ্যেস হয়ে গেল। একদিন দেখলাম হস্টেলের উল্টো ফুটপাথে আধ-মরা একটি মেয়ে আর তার বিশীর্ণ বুকের উপর হাড় বের করা একটি শিশু,— মনে হয় মরেই গেছে। এ জাতীয় দৃশ্য দেখলে স্থানীয় A.R.P. অর্থাৎ 'বিমান-আক্রমণ সাবধানী' দফতরে খবর দেওয়া হত। কারণ তাদের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধপত্র থাকত। হেদোর মোড়ের অফিসে গেলাম। খবরটা দিতেই ছোকরা অফিসার জিগেস করলেন, "কোথায় ?" উত্তর, "ডাফ হস্টেলের সামনে।" "কোন ফুটপাথে ?" "উল্টো দিকের।" "ওটা আমাদের জুরিসডিকশানে না।"

মানুষের মনে চামড়া আছে কি না জানি না। কিন্তু থাকলে বোধ হয় সেটা

সহজেই মোটা হয়ে যায়। ARP কর্মীটিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দুর্ভিক্ষের সময় আমরাও ত' পেট ভরেই খেতাম। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যর জন্য এক আধদিন শখ করে উপোস করেছি। তাতে তাদের কতটা উপকার হয়েছে খবর নেইনি। আমাদের হোটেল-রেস্তোরাঁয় যাওয়াও বন্ধ হয়নি। একটা আশ্চর্য ব্যাপার কেউ খেয়াল করেনি। চালের দাম বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম প্রায় একই ছিল। '৫০-এর দশকে বিদেশে এক ইংরেজ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি '৪৩ সনে কলকাতায় ছিলেন। ওঁর scrap book -এ পাশাপাশি দুটি জিনিস ছিল। একটা ফারপোর বিশেষ ভোজের 'মেনু'— ৬৲ টাকায় সাত কোর্স। পাশে সেই সন্ধ্যারই একটা ছবি— ফারপোর বাইরে ফুটপাথে মুমূর্ষু মানুষের ভীড়। ভুলেও ভাববেন না আমরা অপরাধ বোধে ভুগছি। আমাদের সমাজে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত লোক বিশেষ দেখিনি। অপরাধবোধের ভড়ং অবশ্যি প্রায়ই চোখে পড়ে।

'৪৩-এর দুর্ভিক্ষ কলকাতার রাস্তায় দুঃস্বপ্নের মত এসেছিল। আবার দুঃস্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। পরে নানা রকম হিসেব হল। অন্তত তিরিশ লক্ষ লোক না কি মারা যায়। আর মারা পড়ে পশ্চিমবঙ্গের গো-মহিষের এক-তৃতীয়াংশ। ফলে ঐ অঞ্চলের চাষবাস বরাবরের মত জখম হয়। আর মৃত ব্যক্তির মাথা পিছু চালের কালোবাজারীদের নাকি অন্ততঃ হাজার টাকা মুনাফা হয়।

আমাদের ভাগ্যে আরও দুঃস্বপ্ন বাকি ছিল, সে কথাটা তখনও জানতাম না। যুদ্ধ শেষ হলে দেশনেতারা ছাড়া পেলেন। প্রগতিবাদীরা বললেন,— আপোষ-টাপোষের কাজ না। সমাজ-বিপ্লবের জন্য তৈয়ার হও। বোম্বাই শহরে মহাত্মা-কায়েদে আজম সাক্ষাৎকার হল। IPTA নৃত্যনাট্য করলেন, "They must meet again"। কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। ওদিকে লালকেল্লায় INA সেনাপতিদের বিচার নিয়ে শহরময় তোলপাড়। আশাবাদী ছাত্র-নেতারা বললেন,— এই সুযোগ। এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিদেশী শাসন আর স্বদেশীয়র শোষণ একই সঙ্গে খতম হবে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লাল-সবুজ-তেরঙা ঝাণ্ডা একসঙ্গে বেঁধে INA -সেনাপতি রশীদ আলির মুক্তির দাবিতে সভা হল। তারপর ডালহৌসি স্কোয়ারের নিষিদ্ধ অঞ্চল লক্ষ করে শোভাযাত্রা। ফলে পুলিশের গুলিতে বেশ কজন মারা গেল। পরদিন অত্যাচারের প্রতিবাদে আবার মিছিল। এবার আহতর সংখ্যা অনেক বেশী, নিহতই পঞ্চাশের উপরে। দ্বিতীয় দিনে যারা মারা গেল, তাদের কারও কারও জামার পকেটে নাম-ঠিকানা লেখা চিরকুট ছিল। বাড়ি ফেরা হয়ত হবে না জেনেই তারা মিছিলে যোগ দিতে এসেছিল। অনেক সময় ভাবি— ওরা আজ বেঁচে থাকলে কি করত ? স্বাধীন ভারতে সরকারি চাকরি, মাষ্টারি বা কেরানিগিরি করে এতদিনে অবসর নিত ? না, রাজনীতির পথে এগিয়ে রাজ্যসভা লোকসভা পার হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেত ? ভারতীয় ইতিহাসের বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অনেকবার প্রশ্ন করেছি,— কোন্ স্বার্থের খোঁজে এরা সেদিন মরতে পারে জেনেও রাস্তায় নেমেছিল ?

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কংগ্রেস আর লীগের নিশান একসঙ্গে বাঁধা দেখেছিলাম। কিন্তু ঐ মিলনের দৃশ্যটা নিতান্তই কাঁচা মনের খোয়াব। যতদূর মনে পড়ে রশীদ আলি দিবসের অল্প কয়েক সপ্তাহ পরেই জিন্না সাহেব পাকিস্তানের দাবী বাস্তব করার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করলেন। '৪৬-এর ১৬ই অগস্ট কাছে এসে গেল। রোজ নানারকম গুজব শুনতে লাগলাম। মুসলিম লীগ থেকে না কি ইস্তাহার ছড়াচ্ছে— তাতে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক। রাজাবাজারের বস্তিতে ছুরি ছোরা শানান হচ্ছে— জনৈক 'প্রত্যক্ষদর্শী' তার বিবরণ দিলেন। কিন্তু 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' দিন রক্তপাতের প্রস্তুতি চলছে, ঘটনার আগে কোনও পত্র-পত্রিকা এই রকম আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল বলে মনে পড়ে না।

১৬ই অগাস্ট সকালবেলা বীডন স্ট্রীটের মোড়ের একটা মিষ্টির দোকান সার্কুলার রোডের বস্তিবাসীরা লুঠ করল। ঘটনাটা দেখলাম। লুঠেরারা সবুজ ঝাণ্ডা নিয়ে এবং শোভাযাত্রা করে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু মিষ্টির দোকান লুঠটা কারও রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ ছিল বলে মনে হয় না। পরে শুনি যে কলকাতা শহরের গণহত্যার প্রথম সূচনা ঐ ঘটনা থেকে। বিকেল নাগাদ খবর পেলাম শহরের নানা জায়গায় খুন-খারারি লুঠ-তরাজ শুরু হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তে সুস্থ স্বাভাবিক ভদ্র মানুষের শরীরের ভেতর থেকে যেন হিংস্র সব শ্বাপদ বেরিয়ে এল। মোটামুটি বামপন্থী বলে যে সব ছাত্রদের জানতাম, হঠাৎ তারা আগ্রাসী হিন্দু রূপে দেখা দিল। হিন্দুত্ব আর কিছুতে না,— মুসলমান-বিদ্বেষে। হকিষ্টিক, লাঠিসোটা, কেরোসিন তেলের টিন নিয়ে রাস্তায় নামল সবাই। এ সব কি কাজে লাগবে প্রশ্ন করায় উত্তর পেলাম,— 'আত্মরক্ষা'। কার হাত থেকে আত্মরক্ষা ? চারিদিকেই ত' হিন্দুর বাস। সামনের বস্তিতে কালোয়ারদের আস্তানা। কে আমাদের আক্রমণ করবে ? ঐ মাণিকতলা বস্তির অল্প ক'জন মুসলমান ? রণশাস্ত্রের নতুন পাঠ পেলাম এই সব বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তরে। ''Offence is the best means of defence''। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। পার্ক সার্কাস, এন্টালি, হাওড়ায় হিন্দু খুন হচ্ছে, হিন্দু মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে, একমাত্র কিছু মুসলমান মারলেই ওদের টনক নড়বে। কলকাতার রাস্তায় তিন দিনে অন্তত দশ হাজার মানুষ খুন হয়, তারা সবাই এই নির্বোধ অন্ধ আক্রোশের শিকার। কারও কারও মতে ঐ পৈশাচিক ঘটনা এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর অঙ্গ। কথাটা যদি সত্যি হয় তবে বলতে হবে সত্যিতে যা ঘটল তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। দাঙ্গা বলতে যদি দুই দলের মধ্যে মারামারি বোঝায়, তা হলে '৪৬-এর অগাস্ট মাসে কলকাতা শহরে দাঙ্গা হয়নি। মুসলমান পাড়ায় ছড়ানো-ছিটোন অল্প কিছু হিন্দু থাকত। তাদের নৃশংস ভাবে খুন করা হয়। হিন্দু পাড়ার বাসিন্দা মুষ্টিমেয় মুসলমানরাও তেমনি ভাবেই কোতল হয়। মুখোমুখি লড়াইয়ে এক ধরনের সাহস প্রকাশ পায় এবং ফলে মনুষ্যত্বের একটু তলানি তাতে থাকে। '৪৬-এর হত্যাকাণ্ডে তার ছায়া অবধি ছিল না। মানুষ কোনও জঘন্য কাজ করলে তার বর্ণনায় আমরা 'পাশবিক' কথাটা ব্যবহার করি। কিন্তু ঐ তিনদিন যে সব ঘটনা চোখের সামনে দেখি, কোনও পশুর পক্ষে সে ধরনের কিছু করা সম্ভব মনে

করি না। জীবজন্তুদের ব্যবহারে প্রকৃতির টানা কিছু সীমারেখা থাকে। মানুষ তার মনুষ্যত্ব ভুলে গেলে যা করতে পারে তার বোধ হয় কোনও সীমা নেই।

১৬ই অগাস্ট বিকেল পাঁচটা নাগাদ মাণিকতলা বাজারের সামনে একটা হৈ চৈ শুরু হল। হস্টেলের ছাদে উঠে দেখলাম— ভীড়ের মাঝখানে একটা দশ বার বছরের ছেলে ফলের ঝাঁকা মাথায় দাঁড়িয়ে। মনে হল ভয়ে কাঁপছে। তারপর ভদ্রবেশী কয়েকটি মানুষ তাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করল। ভীড়ের মধ্যে অনেকেই দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে ছুটে পালাল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা খালি। হিন্দু ধর্মের রক্ষকরা তাদের বীরকৃত্য সেরে হাওয়া। রাস্তায় শুধু রক্তমাখা রোগা একটা ছোট্ট শরীর পড়ে রইল। ঘটনাটা প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগের। কিন্তু এখনও দৃশ্যটা বার বার দুঃস্বপ্নে ফিরে আসে।

"আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়" এই রণনীতি অনুসরণ করে মানিকতলার বস্তি পোড়ান হল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিত্য নতুন বীরত্বের খবর আসছিল। নিকিরিপাড়ার বস্তি বেড়া আগুনে পোড়ান হয়েছে। একজনও পালাতে পারেনি। মীনা পেশোয়ারীকে জ্যান্ত অবস্থায় চার টুকরো করা হয়েছে। [যতদূর জানি লোকটি তার অনেক আগেই গতাসু।] ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা অখ্যাত কাগজের বিক্রী হু হ করে বেড়ে গেল, কারণ হিন্দুদের উপর বীভৎস অত্যাচারের কল্পনা-সমৃদ্ধ কাহিনী তার প্রধান উপজীব্য। তিনদিন তিনরাত ধরে শহরের বুকে প্রেতনৃত্য চলল। কোথাও একটি পুলিশ বা সেপাই সেই দক্ষযজ্ঞে বাধা দিল না। হস্টেলের ছাদ থেকে দেখলাম— যতদূর চোখ যায় শুধু আগুন আর আগুন। তিনদিন পর রাস্তায় সাজোয়া গাড়ি দেখা দিল। কোত্‌লে আম্‌ তখনকার মত থামল। খুন-জখম তারপর এক বছর ধরে চলে, কিন্তু সে চোরা পথে।

ইউনিভার্সিটি এসে শুনলাম— রাজাবাজার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হস্টেলে সাত জন খুন হয়েছে। খাটের তলায় আশ্রয় নেওয়ায় যার প্রাণ বেঁচে যায়, তার সারা শরীরও টাঙ্গি আর ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। যারা খুন হয়েছে তাদের শরীর শবঘর থেকে আনা হল। সেখানে মৃতদেহ টাল করে রাখা। শব-ব্যবচ্ছেদ আর সম্ভব্‌ হচ্ছে না। আহত ছেলেটিকে দেখতে হাসপাতালে গেলাম। সেখানে একজন অধ্যাপক বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়-গোছের একটা পরম কারুণিক ভাব মুখে ফুটিয়ে বসে আছেন। ন্যাকামির জন্য অস্কার বা নোবেল প্রাইজের ব্যবস্থা থাকলে উনি পেতেন। ছেলেটির জ্ঞান ফিরতেই আধবোজা চোখে উনি ওকে প্রশ্ন করেন, "তোমরা কিছু বললে না, তবু ওরা তোমাদের মারলে ?" ছেলেটি অতি কষ্টে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, স্যার।" অধ্যাপক তখন তাঁর গভীর মননের ফল আমাদের উপহার দিলেন : "ও ! তবে ওরা তোমাদের মারবে বলেই এসেছিল !" আমরা শুনতাম— এই ন্যাকাধিরাজ পাঞ্জাবির জন্য কতটা কাপড় লাগবে প্রশ্ন করায় দর্জির উত্তর,— "আড়াই গজ", —শুনে মুগ্ধ বিস্ময়ে নিমীলিত নেত্রে বলেন, "আপনারা ক-অ-ত-ও জানেন !"

এই ভদ্রলোক একবার বরিশাল এসেছিলেন। বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিজীবনে উনি অপরিচিত নন। এবং ওঁর শত্রু ও নিন্দুকের সংখ্যাও কম ছিল না। ওঁর শত্রুপক্ষীয় এক সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করতেই ব্যথিত

করুণায় ওঁর মুখখানা পোড়া বেগুনের মত কোমল হয়ে উঠল। উনি বললেন, "ওদের কথা ভাবলে বড় দুঃখ হয়।" প্রশ্ন, "কেন স্যার ?" "তোমরা ছেলে মানুষ, কি বলি বল ? ওরা,—ওরা ভাল নয়।" "কেন ভাল নয় ?" "কি বলব বল !" তারপর আধমিনিট নিস্তব্ধতার শেষে পাঞ্চ লাইন, "খারাপ অসুখ আছে ওদের।" যাঁদের খারাপ অসুখ আছে তাঁদের একজনের সঙ্গে পরে পরিচয় হয়। তাঁর কাছে এই ভদ্রলোকের বিষয় উত্থাপন করায় তিনি সংক্ষেপে বললেন, "এ সব লোক কি জান ? এরা অতি অমায়িক খচ্চর।" পুরীতে অমায়িক খচ্চরের বাসায় আমার বন্ধু কুমার মুখোপাধ্যায় ওরফে সঙ্গীত বিশারদ পণ্ডিত কুমারপ্রসাদ একবার ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। কুমার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিল, নুলিয়ারা উদ্ধার করে। জ্ঞান হতেই দেখল, অদূরে এক জোড়া গোঁফ। গোঁফের উপরিবর্তী চোখ জোড়া বুজে গেল আর বেদমন্ত্রের মত শুদ্ধ উচ্চারণে কুমার তার কি হতে চলেছিল সে কথা শুনল : "আপনি আজ ম্রুতিউর [টীকা : বাংলা উচ্চারণে 'মৃত্যু'] হাত হতে অবিয়াহতি পেলেন।" গুম্ফবানের বিদেশী পত্নী এক মুখ ঝামটা দিলেন, "টুমি ঠামো। উহাকে একটু ডুড খাইটে ডেও।"

জাতীয় জীবনের সেই চরম বিপর্যয়ের দিনগুলিতে হাস্যকর ঘটনার অভাব ছিল না। কারণ ভয় পেলে মানুষ নানা অদ্ভুত আচরণ করে। প্রথম তিনদিনের দাঙ্গা থামলে হ্যারিসেন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের এক মেসে দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে দেখলাম—আবহাওয়া তখনও বেশ উত্তপ্ত। রাস্তার দুই ধারে দুই সম্প্রদায়ের বীরবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রীতিমত আস্ফালন করছে, কিন্তু বীডনস্ট্রীটের বস্তির শিবে-হরের মত কেউই আর পরস্পরের কাছাকাছি এগুচ্ছে না। তিন দিন লড়াইয়ের পর আস্ফালনের সুরও একটু ক্লান্ত। মেজাজটা আন্দাজ করে লুঙ্গিধারী বীরদের একজন ঝাঁটার কাঠিতে একটা ন্যাকড়া বেঁধে মাথার উপর তুলে ধরলেন এবং "পীইইচ, পীইইচ" (অর্থাৎ peace, peace) বলে আওয়াজ দিলেন। শান্তির বীজ উর্বর মাটিতেই পড়ল। "পীচ, পীচ" ধ্বনির প্রতিধ্বনি সনাতন হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হল। তারপর শান্তিচুক্তি পাকার করার উদ্দেশ্যে দুই গণনেতা রাস্তার মাঝখানে neutral ground-এ নেমে এলেন। তারপর প্রীতি ও ভীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। সে কি মর্মান্তিক কোলাকুলি। "কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুইজনা দুইজনে।" আশঙ্কা হোলো, এখনই শিবাজী আফজল খাঁ নাট্যের পুনরভিনয় দেখব। কিন্তু সে সব কিছু হোলো না, দ্বৈরথ যুদ্ধের মত serially দ্বৈরথ কোলাকুলি চলল। দুদিক থেকে দুজন রাস্তার মাঝখানে আসে, তারপর রুটিন মাফিক পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে। আলিঙ্গন শেষ হলেই প্রচণ্ড বেগে স্বশিবিরে প্রত্যাবর্তন। তারপর উভয় পক্ষ "পীচ, পীচ" ধ্বনি দিতে দিতে শান্তির দেবদূতবাহিনীর ভূমিকায় নিজ নিজ বস্তিতে ফিরে গেল।

আমাদের হস্টেলে কিছু খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী পর্বতনন্দন ছিলেন। দাঙ্গার পর গাড়ি চলাচল সুরু হতেই তাঁরা বোচকা বেঁধে বাড়ি পালাতে ব্যস্ত হলেন। হিন্দু পাড়ার মাঝখানে আমাদের পাঁচমিশালি হস্টেল, কাজ করার লোক সবাই বিহারী মুসলমান। আমাদের জনবল থাকায় কেউ হস্টেল আক্রমণ করে ওদের গায়ে

হাত দিতে সাহস পায়নি। তাই আমরা ঠিক করেছিলাম যে অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ হস্টেল ছেড়ে যাব না। হঠাৎ সেই জোট ভাঙার সূচনা দেখে ভয় পেলাম। পর্বতনন্দনদের বোঝালাম,—কেন পালাচ্ছ। তোমাদের চেহারা-পোশাকেই বোঝা যায় তোমরা অন্য অঞ্চলের লোক। কে তোমাদের মারবে ? তোমরা কি হিন্দুদের ভয় পাচ্ছ ? উত্তর : "No man, we are not afraid of the Hindus." না, হিন্দুদের ওরা ভয় পায় না। তবে ? এ পাড়ায় ত' মুসলমান নেই। তোমরা কি মুসলমানদের ভয় পাচ্ছ ? "No man, we are not afraid of the Muslims." তবে ? এবার আসল অসুবিধাটা বুঝিয়ে বলল, "You see, man; these Hindus and Muslims, the difficulty is they cut you into picees." মানে ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের অনুগামীরাই মানুষ ধরে ধরে টুকরো টুকরো করছে—এই যা অসুবিধে। এই সামান্য অসুবিধার জন্যই ওরা দেশে ফিরে গেল, কিছুতেই ধরে রাখা গেল না।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মানুষের রাজনৈতিক সংস্কার কি ভাবে বদলায় তার কিছুটা আঁচ পেলাম। ট্রাম-বাস চলা শুরু হলে আমার আত্মীয় কিরণশঙ্করবাবুর বাড়ি যাই। ওঁর বসবার ঘরে একটু পরেই পাড়ার কিছু লোক এল। "স্যার, আমরা একটা আত্মরক্ষা সমিতি করেছি।" 'আত্মরক্ষা' বলতে কি বোঝাত আগেই লিখেছি। নিরুপায় ভাবে কিরণশঙ্করবাবু বললেন, "তা আমার কি করার আছে ? আপনাদের 'আত্মরক্ষা'য় যোগ দেওয়া ত' একটু মুশকিল।" "না, না, তা বলছি না। পূর্ণ গুণ্ডা আমাদের নেতৃত্ব করছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।" "সে ত' আমার সৌভাগ্য। নিয়ে আসুন তাঁকে।" কোমরে গামছা বাঁধা ফতুয়া গায়ে ষণ্ডমার্কা একটি লোককে সসম্ভ্রমে তারা বসবার ঘরে নিয়ে এল : "ইনিই পূর্ণ গুণ্ডা।" কিরণশঙ্কর বাবু দু' হাত জুড়ে নমস্কারান্তে বললেন, "আসুন পূর্ণ গুণ্ডা, বসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণ্ডাদের নেতৃত্বে বরণ শুধু ঐ একটি পাড়ায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঁঠার মাংস বিক্রেতা প্রখ্যাত গুণ্ডা রাখাল বা পাঁঠা রাখালকে [প্রকৃত নামটা চেপে গেলাম।] হিন্দু হস্টেলের কিছু ছাত্র তাঁদের রক্ষক সাব্যস্ত করলেন। কবি ও সাম্যবাদী কর্মী বন্ধুবর অমলেন্দু গুহ হস্টেলের জাতীয় সঙ্গীত বলে গান বাঁধলেন,— 'ঐ মহামানব আসে'র সুরে— "ঐ পাঁঠা রাখাল আসে।"

এ সব সময় বিপদটা মানুষের গা-সওয়া হয়ে যায়। মনে হয়— যাই ঘটুক, আমার কিছু হবে না। ঠনঠনের মোড়ে, কলুটোলা অঞ্চলে এবং আরও অনেক জায়গায় বাসে এসিড বাল্‌ব ছোড়া, এবং স্টেন গান চালান রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পথে ছোরা-ছুরি চলারও বিরাম ছিল না। ঐ সব রাস্তা দিয়ে রোজই যাওয়া-আসা করতে হত। পথে রক্তাক্ত আহত বা নিহত মানুষ পড়ে আছে বহুবার দেখেছি। কিন্তু সাক্ষাৎ কোনও বিপদে কখনও পড়িনি। সংখ্যাবিজ্ঞানের সম্ভাবনা তত্ত্ব বা Probability Theory অনুযায়ী ভয়ের কারণ বিশেষ ছিল না। যে শহরে বহু লক্ষ মানুষের বাস, সেখানে বিশ-পঁচিশ হাজার লোক খুন-জখম হলে তাপটা অধিকাংশ বাসিন্দাদের গায়ে লাগে না। মনেও কি লাগে না ? সম্ভবত না। না হলে সুস্থ চিত্তে এতদিন এতগুলি মানুষ বেঁচে

আছি কি করে— এক বছর ধরে নরকের দৃশ্য রোজ দেখা সত্ত্বেও ? গণমানসে স্মৃতি জিনিসটাও বোধ হয় নিতান্ত ভঙ্গুর। না হলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের নামে নির্দোষ নিরীহ মানুষকে বীভৎস ভাবে খুন বা বিকলাঙ্গ করা আজও চলছে কি করে ?

ক্রমে দেশ-ভাগটা কঠিন সত্য হয়ে দেখা দিল ! শুধু ভারতবর্ষ না, বঙ্গভূমিও দু-ভাগ হবে। যাঁরা একদিন বঙ্গভঙ্গ বন্ধ করার জন্য গণ-আন্দোলনের পথ নেন, তাঁদেরই উত্তর পুরুষ নয়া বঙ্গভঙ্গের দাবী তুলে সফলকাম হলেন। র‍্যাডক্লিফ সাহেব দুই বঙ্গের সীমানা নির্দেশ করে ম্যাপে লাইন টানবেন। তাঁর কাছে আরজি পেশ করার জন্য অনেকে উঠে পড়ে লাগলেন, যাতে তাদের জেলাটি পূর্ব পাকিস্তানে না পড়ে হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। বরিশাল পশ্চিমবঙ্গে আনার চেষ্টা অবিশ্যি খুব একটা হয়নি।

আমরা বুঝলাম,— পূর্বপুরুষের ভিটে এবার ছাড়তে হবে। ধর্মগত পার্থক্যর ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্র পত্তন হবে, সেখানে মুসলমান ভিন্ন অন্য সব সম্প্রদায়ের নাগরিক দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হবেন, রাজনীতির যুক্তিতে এই কথাই দাঁড়ায়। তা ছাড়া দাঙ্গার অভিজ্ঞতার ফলে নিরাপত্তা সম্বন্ধেও কিছুটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেশ ছাড়ার পথে মস্ত এক বাধা দাঁড়াল— সতীনদা। উনি বললেন,— এই সময় কারও দেশ ছেড়ে যাওয়া চলবে না ! বললাম,— সতীনদা, আপনি ত' ফকির। আমরা সংসারী মানুষ ! রুজির জোগাড় করতে হবে। মা-বোনের ইজ্জতের কথাটাও ভুলতে পারব না। কিন্তু ভবী ভুলবার লোক নন। উনি আমাদের দেশত্যাগে কিছুতেই রাজী নন। ওঁর এই কথাটা আমরা শেষ অবধি রাখতে পারিনি। স্বার্থবোধহীন নির্ভয় মানুষটি পাকিস্তানেই থেকে যান। ওঁর বাকী জীবনটার অধিকাংশই জেলে কাটে। এই নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ ওঁর সামনে খোলাই ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে চলে আসার কথা একবারও ওঁর মনে হয়নি। ঢাকার জেলে যক্ষ্মা হয়ে সতীনদা মারা যান। জীবনের শেষ ক' মাস উনি একটা ডায়েরি রাখতেন। তাতে একটা কথা পাই। নার্সরা ওঁকে জিগেস করত,— 'তোমার কেউ নেই ? তোমাকে ত' কেউ দেখতে আসে না ?' উনি বলতেন, "দেখো, আমি মরলে কত লোক আমাকে দেখতে আসবে।" ওঁর মৃত্যুর পর পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা সত্যিই হাজারে হাজারে ওঁকে দেখতে এসেছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে ১৪ই অগাস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হল। রাত বারটায় কীর্তনখোলা নদীর উপর ভীড় করা স্টীমার, স্টীম লঞ্চ, মোটরবোট গম্ভীর ভেঁপু-নিনাদে নয়া রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণা করল। আকাশভেদী জয়ধ্বনি উঠল, "নারা-এ তকদীর— আল্লাহু আকবর" "কায়েদে আজম জিন্দাবাদ" "পাকিস্তান জিন্দাবাদ"। আমরা শুনেছিলাম— সে রাত্রে দাঙ্গা হবে। বাড়িতে একটিমাত্র বন্দুক। সত্যিতে দাঙ্গা হলে ঐ একটি অস্ত্র কি কাজে লাগত জানি না। বন্দুকটা হাতে নিয়ে বাবা সারারাত বসে থাকলেন। ১৯২০ সনে মানুষটি কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার সাতাশ বছর পর অগাস্ট মাসের এই অন্ধকার রাতে দেশ সত্যিই স্বাধীন

হল। স্বাধীনতার রাত্রে বাবা কি ভাবছিলেন আমরা ওঁকে জিগেস করিনি। উনিও সে কথা আমাদের কখনও বলেননি।

—

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

9 788172 151959